সালতানতে মুস্তাফা

হাকিমুল উম্মত
মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী

মুহাম্মদী কুতুবখানা

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

سلطنت مصطفى

সালতানতে মুস্তাফা

মূল ঃ হাকিমূল উম্মত
মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ ৬১৮৮৭৪

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রকাশনায়ঃ

মিসেস হাসিনা রহমান
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ চিত্রনেঃ

কালার ওয়েভ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল ঃ

পহেলা জানুয়ারী ২০০০ সাল
● পুনঃ মুদ্রণ ঃ ৮ জুন ২০০৪ ইং
● পূনঃ- মুদ্রন ২৪/১১/২০০৭

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

● হাদিয়া ঃ ৭০ টাকা

কমিউটার কম্পোজঃ

এনাম্‌স প্রিন্টার্স এণ্ড কম্পিউটার
৩৯, শাহী জামে মসজিদ শফিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণেঃ

আনন প্রেস
নজির আহমদ চৌধুরী রোড
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

শাহান শাহে দো-আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যে সৃষ্টিকূলের মালিক, তা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেব বিরচিত ,সালতানতে মুস্তাফা' পাঠে কিছুটা আঁচ করা যায়। তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে আল্লাহ তায়ালা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে উভয় জাহানের কর্তৃত্ব দান করেছেন। পুস্তিকাটি সুধী পাঠক মহলের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছে। পুস্তিকাটি মূলতঃ উর্দু ভাষায় রচিত। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ পরিচালক হাফেজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীদের মনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কারণ বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই খুবই দুর্লভ। তিনি বইটি একে একে চার বার পুনঃ মুদ্রণ করেন। গত বছর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বইটি পুনঃ মুদ্রণ করা আর সম্ভব হয়নি। বইটির ক্রমবদ্ধমান চাহিদার কারণে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বইটি প্রকাশ করার জন্য তাঁর সাথে যোগাযোগ করি। তাঁর পরিবারের লোকেরা নিজেরাই বইটি শীঘ্র প্রকাশ করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দেন। দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষা করার পর ও বার বার যোগাযোগ করে বিফল হয়ে আমি নিজেই অনুবাদ করে প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। আমার অনুবাদটা তত উন্নত না হলেও সহজ ও সরল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠক মহলের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে।

অনুবাদক

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সূচীঃ

বিষয় | **পৃষ্ঠাঃ**

বিষয়	পৃষ্ঠাঃ
মূল লেখকের ভূমিকা	১
হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব	১৮
কুরআনের আয়াত দ্বারা হুযূরের রাজত্ব প্রমাণ	২০
হাদীছ শরীফের দ্বারা হুযূরের রাজত্ব প্রমাণ	২৮
ওলামায়ে উম্মতের উক্তিসমূহ্	৪৪
হুযূরের রাজত্ব সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের উক্তি সমূহ	৫৪
যুক্তি ভিত্তিক দলীল সমূহ	৫৮
হুযূরের শান মান ও রাজত্ব সম্পর্কে আপত্তি সমূহ ও এ সবের জবাব	৬৫
উপসংহার	৮৫
হুলিয়া মুবারক	৮৮
একটি উপদেশ	৯১

সালতানতে মুস্তাফা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰے وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِى الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ

দুনিয়াবী রাজা-বাদশাগণ তাঁদের দরবারের আদব-কায়দা এবং দরবারে হাজির হওয়ার নিয়ম কানুন নিজেরাই প্রনয়ণ করেন অর্থাৎ আমার দরবারে আসলে এভাবে দাঁড়াও, এভাবে কথা বল, এভাবে সালাম কর ইত্যাদি এবং নিজেদের নিয়োজিত প্রশাসকদের মাধ্যমে সেগুলো মেনে চলতে প্রজাগণকে বাধ্য করেন। যারা এসব নিয়ম কানুন মেনে চলে বাদশা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যারা এর বিপরীত করে, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। তাঁদের এসব আইন-কানুন কেবল মানুষের উপর প্রযোজ্য; জীন, ফিরিস্তা ও অন্যান্য জীব-জন্তুর উপর প্রযোজ্য হয় না। কেননা ওদের উপর এদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তাছাড়া এসব আইন-কানুন বাদশাহ যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন যাবৎ বলবৎ থাকে। বাদশাহের চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে দরবার শেষ এবং সমস্ত আইন-কানুনও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার গড়ে উঠে নতুন দরবার, নতুন আইন-কানুন।

هر كه آمد عمارت نو ساخت
رفت ومنزل به ديگرے پرداخت

অর্থাৎ এ দুনিয়াতে প্রত্যেকে এসে নতুন প্রাসাদ তৈরী করে। কিছু দিন পর সেটা ফেলে চলে যায়। আবার অন্যজন এসে সেটা আবাদ করে।

এ আসমানের নীচে আর একটি এমন দরবারও আছে যার আদব-কায়দা, হাজির হওয়া ও সালাম কালাম করার নিয়ম কানুন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রনয়ণ

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করেছেন। স্বীয় সৃষ্টিকূলকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন - হে আমার বান্দাগণ! যখন এ দরবারে আসবে তখন এ নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। অন্যথায় তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। মজার ব্যাপার হলো সেই মহান শাহী দরবার আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছে, দরবারের শান-শওকত অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সেই শাহান শাহও পর্দার অন্তরালে চলে গেছেন। কিন্তু সেই দরবারের আইন-কানুন এখনও অবিকল বলবৎ রয়েছে। অধিকন্তু সেই দরবারের আইন-কানুন শুধু মানব জাতির উপর বলবৎ নয় বরং এর পরিধি এত বিস্তৃত যে ফিরিস্তাকূল বিনা অনুমতিতে ওখানে যেতে পারে না, জ্বীনজাতি নত শিরে প্রবেশ করে, জীব-জন্তু সেই শাহান শাহকে সিজদা করে। নিষ্প্রাণ পাথরের টুকরা এবং গাছ-পালা তাঁরই কলেমা পড়ে এবং তাঁরই ইশারায় এগিয়ে আসে। চন্দ্র-সূর্য তাঁরই নির্দেশে চলে। তাঁরই ইঙ্গিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাঁরই নির্দেশে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মোট কথা আসমান-জমীনের সমস্ত কিছু তাঁর হুকুমের আওতাধীন।

মুসলমান ভাইগণ! বুঝতে পারছেন, সেই দরবারটি কার? সেটা হচ্ছে উভয় জাহানের মুখতার, হাবীবে কিরদেগার, শাহান শাহে কাউনাইন, শফিউল মুজনিবীন রহমাতাল্লিল আলামীন আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শাহী দরবার। প্রিয় বন্ধুগণ, চলুন, এবার আমরা কুরআন শরীফের পাতা উল্টায়ে দেখি- আল্লাহ তা'আলা দরবারে মুস্তাফার জন্য কি কি আইন-কানুন প্রণয়ন করেছেন।

হুযুরে আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জাহেরী জিন্দেগী কালে কিছু লোক তাঁর আগেই কুরবানী করে ফেলতেন এবং কিছু লোক রমজান আসার আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করে দিতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহু তা'আলা ইরশাদ ফরমান:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(হে ঈমানদার গণ, আল্লাহ ও রসূলের অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।)

এ আয়াতের মধ্যে এ আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন মুসলমান কাজে কর্মে, কথা বার্তায়, চলা ফেরায় মোট কথা যে কোন বিষয়ে যেন আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অগ্রগামী না হয়। হযরত কাইস ইবনে শাহাস নামে এক সাহাবীর কণ্ঠস্বর বড় ছিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর বড় হয়ে যেত। আল্লাহর হাবীবের দরবারে কেউ উচ্চস্বরে কথা বলুক, তা আল্লাহর কাছে মোটেই পছন্দ ছিল না। তাই ইরশাদ ফরমান-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ
تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ –

(হে ঈমানদারগণ! নবী আলাইহিস সালামের কণ্ঠস্বর থেকে স্বীয় কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তাঁর সামনে চেঁচামেচি করে কথা বলো না, যেমন তোমরা একে অপরের সাথে চেঁচামেচি করে কথা বল। যাতে তোমাদের অজান্তে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে না যায়।)

সুবহানাল্লাহ! কি সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়েছেন-এ দরবারে আগমনকারীদের উচ্চস্বরে কথা বলারও অনুমতি নেই। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত কাইস ইবনে শাহাস (রাদি আল্লাহ আনহু) ভয়ে হুযুরের দরবারে হাজির হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একদিন হুযুর (আলাইহিস সালাম) জানতে চাইলেন, কয়েক দিন যাবত দরবারে কাইস আসতেছে না কেন? সাহাবায়ে কিরাম হযরত কাইসের ঘরে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি। কারণ আমার কণ্ঠ স্বর বড়। সদ্য নাযিলকৃত আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ খবর শুনে ফরমালেন- সেতো জান্নাতী। আয়াত নাযিল হওয়ার আগে যা হয়ে গেছে সেটা মাফ। সেই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর,ওমর ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) হুযুরের দরবারে এমন নিম্ন স্বরে কোন কিছু আরয করতেন যে হুযুর

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আলাইহিস সালামকে বারবার জিজ্ঞেস করতে হতো যে ওনারা কি বলতে চাচ্ছেন। ওনাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

(নিশ্চয় যারা আল্লাহর রসূলের সামনে স্বীয় কণ্ঠস্বর নীচু করে, তারা হচ্ছে ওসব লোক যাদের অন্তরকে পরহেজগারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।

বোঝা গেল, এটা এমন দরবার যেখানে মাথা উঁচু কারার কারো সাহস নেই।

اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں

سارے انہیں کا منہ تکتے ہیں

অর্থাৎ তাঁর দরবারে বড় বড় মনীষীগণ মাথা নত করে থাকেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে কি বের হচ্ছে সেটা শুনার জন্য সবাই অপেক্ষায় থাকেন।

বনী তমীম গোত্রের কিছু লোক দ্বিপ্রহরের সময় নবীজীর দরবারে আগমন করে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কামরায় আরাম করছিলেন। ঐ সব লোকেরা কামরার বাহির থেকে ডাকা ডাকি শুরু করলো। যেখানে হযরত জিব্রাঈল বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন না, সেখানে এরা এ ভাবে ডাকা ডাকি শুরু করছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তা পছন্দ হলো না। সঙ্গে সঙ্গে নাযিল হলোঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

(হে মাহবুব! যারা আপনাকে কামরার বাহির থেকে ডাকাডাকি করে তাদের প্রায় সকলই নির্বোধ।)

অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাদের শিক্ষার জন্য ইরশাদ ফরমানঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(যদি তারা আপনি তাদের নিকট আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতো, তাহলে সেটা তাদের জন্য মঙ্গল ছিল। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।)

এ আয়াত দ্বারা এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে যদি কোন লোক এমন সময় আসে, যখন হুযুর (আলাইহিস সালাম) স্বীয় ঘরে অবস্থান করছেন, তখন যেন ডাকাডাকি না করে বাহিরে তশরীফ আনার অপেক্ষায় থাকে। তশরীফ আনার পরই যেন আবেদন-নিবেদন যা আছে তা পেশ করে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত জয়নব (রাঃ) কে বিবাহ করার পর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে ওলীমায় দাওয়াত দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম দলে দলে এসে খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেলেন। কিন্তু তিনজন সাহাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেখানে বসেই দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তায় নিয়োজিত রইলেন। ঘরের জায়গাটা ছিল সংকীর্ণ। ওদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকাটা হুযূরের কাছে কিছুটা বিরক্তকর মনে হলো। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে চলে যেতে বলতে পারলেন না। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাঁর হাবীবকে এ ভাবে বিরক্ত করা মোটেই পছন্দ হলো না। তাই তিনি নাযিল করলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا وَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

(হে ঈমানদারগণ! নবীর গৃহে খানার দাওয়াত দিলে খাবার তৈরী হওয়ার আগে ঘরে প্রবেশ করো না। অবশ্য যখন ডাকা হবে, তখন প্রবেশ কর। তবে খাবার খেয়ে বের হয়ে যাও। বসে আলাপ আলোচনায় রত হয়ো না)

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাবারক তা'আলা এ শিক্ষা দিলেন যে, নবীর দরবারে খানার দাওয়াত দিলে খাবার তৈরী হওয়ার আগে যেন ওখানে না যায়

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এবং খাবার গ্রহণ করার পর যেন ওখানে বসে না থাকে। আল্লাহ তাআলা এর কারণ বর্ণনা করছেন ঃ

إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

(তোমাদের এ আচরনের দ্বারা আমার নবীর কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন। আল্লাহ হককথা বলতে সংকোচবোধ করেন না।)

সাহাবায়ে কিরামের এটা নিয়ম ছিল যে যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কোন শব্দ না বুঝতেন, তখন আরয করতেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ رَاعِنَا (হে আল্লাহর রসূল, হে আল্লাহর হাবীব,আমাদের প্রতি একটু সদয় হোন অর্থাৎ শব্দটি আর একবার বলুন যাতে আমরা বুঝতে পারি।) رَاعِنَا শব্দটি ইহুদীদের ভাষায় গালিবোধক। তাই তারা সেই নিয়তে শব্দটি নবীর দরবারে বলতে শুরু করলো এবং মনে মনে খুশী হলো যে নবীর দরবারে এ ভাবে গালি দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। কিন্তু সেই সর্বজান্তা আল্লাহ পাক তাঁর স্বীয় হাবীবের দরবারে এ ভাবে বেআদবী করার সুযোগ দিলেন না। তিনি নাযিল করলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(হে ঈমানদারগণ! رَاعِنَا (রায়িনা) বলনা বরং বল اُنْظُرْنَا (হে রসূলল্লাহ, আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখুন) এবং মনোযোগ সহকারে শুন কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল দরবারে মুস্তাফার এমন সম্মানিত স্থান যেখানে এমন শব্দ বলারও অবকাশ নেই, যেটার বিকৃত অর্থ করে ইসলামের দুশমনেরা বেআদবী করার সুযোগ পায়।

এক সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে ধনী মুসলমানেরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথাবার্তা এমন দীর্ঘায়িত করে ফেলতেন যে গরীব মুসলমানেরা কিছু আরয করার সুযোগও পেতেন না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقَةً

(হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর রসূলের কাছে কিছু আরয করতে চাও তখন স্বীয় আরযী পেশ করার আগে কিছু সাদ্‌কা প্রদান কর।)

দেখুন, আল্লাহর দরবারে আবেদন-নিবেদন করতে অর্থাৎ নামায পড়তে অযু করাটাই যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহর মাহবুবের কাছে কিছু আরয করতে হলে প্রথমে সদকা-খয়রাত করার জন্য বলা হয়েছে। এর পিছনে দুটি সুফল রয়েছে একেতঃ সদ্‌কার শর্তারোপ করার দ্বারা গরীব মুসলমানেরাও দরবারে মুস্তাফায় কিছু আরয করার সুযোগ পাবে। দ্বিতীয়তঃ অন্তরে দরবারে মুস্তাফার মর্যাদা স্থান পাবে। যে জিনিসটা আর্থিক ব্যয় ও শারীরিক কষ্ট দ্বারা অর্জিত হয়,সেটার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত আয়াতটি যদিওবা রহিত হয়ে গেছে কিন্তু এর দ্বারা দরবারে মুস্তাফার শানমানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবকে মক্কা মোয়াজ্জমায় না রেখে ওখান থেকে তিনশ মাইল দূরে মদীনা মনোয়ারায় অবস্থানের ব্যবস্থা করেন, যাতে কোন ব্যক্তি হজ্বের উসীলায় যেয়ারত করার সুযোগ না পায় বরং যেয়ারতের জন্য যেন আলাদা অন্যত্র সফর করার প্রয়োজন হয় এবং যেয়ারতের কদর উপলব্ধি করতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান ঃ

يَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

(হে ঈমানদারগন! আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাথে সাথে সাড়া দাও)

এ আয়াতে দরবারে মুস্তাফার এ আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে যখনই মাহবুবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ডাক আসে,তখন যে

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কোন অবস্থায় সাথে সাথে যেন হাজির হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কিরাম এ শিক্ষার উপর যথাযত আমল করেছেন। আমার রচিত "শানে হাবীবুর রহমান" কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারত বিবরণ দেয়া হয়েছে। নামাযরত অবস্থায় কোন সাহাবীকে হুযূর (আলাইহিস সালাম) তলব করলে নামায ত্যাগ করে হুযূরের দরবারে হাজির হয়ে যেতেন। এমন কি জনৈক সাহাবী স্ত্রীর সাথে মিলন কালে হুযূরের আহবান শুনে কাজ শেষ না করে হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে যান। এ রকম অনেক ঘটনা রয়েছে।

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালামের আনুগত্যই হচ্ছে মূল। অন্যান্য যাবতীয় ফরজ কাজ গুলো হচ্ছে আনুসঙ্গিক বিষয় মাত্র।

এ কয়েকটি আয়াত, যেখানে দরবারে মুস্তাফার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে, নমুনা হিসেবে পেশ করা হলো। বিস্তারিত লিখতে গেলে এর জন্য বিরাট দফতর প্রয়োজন। তাই এ কয়েকটি আয়াতই যথেষ্ট মনে করলাম। উল্লেখিত আয়াত সমূহে আদব শিক্ষার সাথে সাথে প্রসঙ্গক্রমে এটাও জানা গেছে যে আল্লাহ আদববান ও ভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে পুরস্কৃত করেছেন। যেমন অনেককে তক্ওয়ার উপাধী দেয়া হয়েছে, অনেককে মাগফেরাত ও বড় বড় প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অনেকের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে আল্লাহ ওদের প্রতি সন্তুস্ট, ওনারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। মোট কথা ওনাদের প্রসংশায় পবিত্র কোরআন ভরপুর।

বেআদবদের প্রতি খোদার কি যে গজব নাজিল হয়েছে, এর লম্বা চওড়া বিবরণ না দিয়ে মাত্র দুটি ঘটনা বর্ননা করছি ঃ

ওলিদ ইবনে মগীরা আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একবার বেআদবী করেছিল এবং তাঁকে পাগল বলেছিল। তার এ বেআদবীতে আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খুবই মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন। এতে আল্লাহর গজবের সাগর উতলিয়ে উঠলো

www.AmarIslam.com

এবং সূরা কলম নাজিল করলেন। সূরার প্রথমে তাঁর মাহবুবের ফযীলত ও গুনাবলী বর্ণনা করে তাঁকে শান্তনা দিলেন ঃ

مَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ - وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ- وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ-

(হে আমার মাহবুব, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন। আপনার জন্য রয়েছে সীমাহীন ছওয়াব এবং নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রবান) অর্থাৎ হে মাহবুব, সে যা বলতে চায় বলুক। আমি তো আপনার প্রসংশা করছি। আপনি ওর কথায় কান দিবেন না। আপনি আমার কথাই শুনুন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ- مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ- عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝

(সে মিথ্যা শপথ কারী, ঘৃনিত, লাঞ্ছিত, নিন্দুক, চোগলখোর, সৎকাজে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, পাষান হৃদয় , সর্বোপরি জারজ সন্তান।)

ওলিদ এ আয়াত শুনে তার মায়ের কাছে গিয়ে বললো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার দশটি দোষ বর্ণনা করেছে। নয়টি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। বাস্তবিকই ঐ সব দোষ আমার মধ্যে রয়েছে। তবে জারজ সন্তান কি না , এ দোষের ব্যাপারে একমাত্র তুমিই বলতে পার। সত্যি সত্যি বল, আমি জারজ সন্তান কি না? অন্যাথায় তোমার গরদান দু'টুক্রা করে ফেলব। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কথা মিথ্যা হয় না। তদুত্তরে ওর মা বললো, ঠিকই তুমি জারজ সন্তান। তোমার বাপ ছিল পুরুষত্বহীন কিন্তু অনেক সম্পদের অধিকারী ছিল। মনে করলাম যে আমার কোন সন্তান না হলে ধন সম্পদ অন্যরা নিয়ে যাবে। তাই এক রাখালের সাথে যিনা করেছিলাম। তুমি তারই ঔরষজাত।

এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রকাশ পায়, যে সব জ্ঞানপাপিরা হুযূর আলাইহিস সালামের সমালোচনা করাটা নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের জন্মে গলদ থাক্তে পারে। এ সব ব্যক্তিদের স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত তলিয়ে দেখা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উচিৎ। আল্লহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ (আমি তার শুঁড়েরমত থুতনীর উপর দাগ দিব) অর্থাৎ তার চেহারা বিকৃত করে দিব, যাতে তার ভিতরের কালিমা চেহারায় প্রকাশ পায়। পরকালে তো যা হবার আছে, তা হবে, দুনিয়াতেও ওলিদের চেহারা ছুরত বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। (জালালাইন, খাজায়েন ইত্যাদি) এখনও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শানে অশোভনীয় উক্তি কারীদের চেহারায় ঈমানী জ্যোতি দেখা যায় না। অনেক বেআদবদের মূখ মণ্ডলে মাছি বন বন করতে এবং শেষ কালে চেহারা বিকৃত হয়ে যেতে দেখা গেছে। (আল্লাহর কাছে এর থেকে পানা চাই)

একবার বেআদব আবু লাহাব হুযূরের দরবারে এসে বললো, তোমার হাত ভেঙ্গে যাক। এতে আল্লাহর গজবের সাগর উথলিয়ে উঠলো এবং নাজিল হলো ঃ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - مَآاَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ-

(আবু লাহাবের হাতদ্বয় ধ্বংস হয়ে যাক (ভেঙ্গে যাক) সে ধ্বংস হয়েই গেছে। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন কোন কাছে আসেনি। অচিরে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে সে ও তার স্ত্রী , যে লাকড়ীর বোঝা বহন করে, তার গলায় খেজুরের আশের রশি।)

এ বদনসীব আবু লাহাব হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শানে দুর্ব্যবহার করায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওকে ও ওর স্ত্রীকে এত কিছু শুনানো হলো এবং ওর স্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে যা ইরশাদ করা হয়েছে তাই হলো। ওর স্ত্রী উম্মে জমীলা হুযূরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেই কাঁটার বোঝা মাথায় বহন করে এনে হুযূরের চলা চলের পথে দিয়ে রাখতো। একদিন কাঁটার বোঝা আনতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে একটি পাথরের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। একজন ফিরিশতা পিছন থেকে ওর কাঁটার বোঝা টান দিলে সে

www.AmarIslam.com

পড়ে যায় এবং বোঝার রশিতে ওর গলায় ফাঁস লেগে মারা যায়।

এখন ওলিদও নেই, আবু লাহাবও নেই। কিন্তু দিনরাত সবখানে তাদের উপর লানত বর্ষিত হচ্ছে। নামাযী নামাযে, কুরআন তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াতে তাদের প্রাপ্ত উপাধি উল্লেখ পূর্বক অভিশাপ দিচ্ছে।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে বাহ্যিক চোখের সামনে সেই দরবার এখন আর নেই। সেই ওলীমার দাওয়াতের ধুমধামও নেই। সেই মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর এখন আর শুনা যায় না। সেই দরবারের অপূর্ব দৃশ্য দেখার ও প্রিয় নবীর পবিত্র মূখে খোদার কালাম শুনার সৌভাগ্যও আমাদের হলো না।

جو ہم بھی وھاں ہوتے خاك گلشن لپٹ مے قدموں سے لیتے اترن
مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے

অর্থাৎ, যদি তখন আমরা থাকতাম, তাঁর পদধুলি নিয়ে ধন্য হতাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে আমরা বঞ্চিত হলাম।

তবে সেই দরবারের আদব এখনও মানুষের সামনে পূর্ববৎ রয়েছে। হাবীবের স্মরণ, হাবীবের সাক্ষাত অপেক্ষা কম আনন্দদায়ক নয়। যদিওবা পরবর্তীকালের লোকদের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তবুও অন্ততঃ শুনে ঈমান আনার সুযোগ লাভ করলো। বিভোর হয়ে আল্লামা ইকবালের নিম্নের কবিতাটি পাঠ করে তৃপ্তিবোধ করুন ঃ

ادب کا ہیبت زیر اسمان از عرش نازك تر
نفس گم کرده می اید جنید وبا یزبد ایں جا

অর্থাৎ এ পৃথিবীতে আদবের স্থান আরশ অপেক্ষা সম্মানিত। জুনাইদ, বাইজিদের মত মহামনীষীগণ তথায় নিজেদেরকে বিলীন করে দিয়েছেন।

বারগাহে রেসালত থেকে বিতাড়িত ব্যক্তির কোথাও স্থান নেই। দুনিয়াবী বাদশাহগণের দরবারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর রেহায় পেয়ে যায় কিন্তু বারগাহে রেসালতে দোষী সাব্যস্ত অপরাধীরা জিন্দেগীতে পায়না কোন ইজ্জত, না কবরে পায় কোন স্বস্থি, না হাশরে পাবে কোন আরাম। পক্ষান্তরে সেই দরবারের মকবুল বান্দারা সব জায়গায় ইজ্জত পায়।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আলা হযরত খুবই সুন্দর বলেছেন ঃ

تو جو للکار دے آتا ہوا الٹا پھرجائے

تو جو چمکادے ہر پھر کے ہو تیرا تیرا

دل پہ کندہ ہو ترا نام کہ وہ وزور رحیم

الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا

অর্থাৎ আপনি যাকে ভয় দেখান, সে সব সময় আপনার থেকে দূরে থাকে আর যাকে আদর করেন সে সব সময় আপনার সান্নিধ্যে থাকে। যার অন্তরে আপনার প্রেম রয়েছে, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না।

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড المناقب শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ওহী লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পরে সে অভিশপ্ত মুরতেদ হয়ে গেল এবং হুযূর আলাইহিস সালামের দোষারোপ করতে লাগলো। মৃত্যুর পর ওকে যখন দাফন করা হলো তখন জমীন ওকে কবর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করলো। ওর বন্ধু-বান্ধবরা মনে করলো যে সম্ভবতঃ রসূলের অনুসারীরাই এ কাজ করেছে । ওরা পুনরায় আরও গভীর করে কবর খনন করে ওকে দাফন করলো। কিন্তু জমীন ওকে পুনরায় বাইরে নিক্ষেপ করলো। এ ভাবে লাশ কয়েকবার দাফন করা হলো এবং প্রত্যেকবার বাইরে নিক্ষিপ্ত হলো। পরে সবাই বুঝতে পারলো যে এ দরবারে মুস্তাফা থেকে বিতাড়িত, একে কেউ গ্রহণ করবে না।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা মুদারেজুন নাবুয়াত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। হুযুর আলাইহিস সালামের দু'কন্যা হযরত রোকেয়া ও কুলসুম (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর সাথে আবু লাহাবের দু'ছেলে উতবা ও উতাইবার বিবাহ হয়েছিল। তখনও মুশরিকদের সাথে বিবাহ হারাম হয়নি। যখন সুরা লাহাব নাযিল হয় তখন আবু লাহাব তার ছেলেদ্বয়কে বললো- মুহাম্মদের মেয়েদেরকে তালাক দিয়ে দাও। অন্যথায় আমি তোমাদেরকে আমার উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত করবো।' অতঃপর উতাইবা দরবারে

মুস্তাফায় হাজির হয়ে স্বীয় অপারগতা প্রকাশ করে তালাক দিল আর উতবা হুযূরের শানে বেআদবী করে তালাক দিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন,হে আল্লাহ ওকে শাস্তি দেয়ার জন্য তোমার কোন হিংস্র জন্তুকে নিয়োজিত কর। উতবা এটা শুনে ভয় পেয়ে গেল এবং আবু লাহাবকে গিয়ে বললো। আবু লাহাব বুঝতে পারলো, ওর ছেলে উতবার রক্ষা নেই। ওর উপর মুহাম্মদের বদ দুআ পড়েছে। তবুও ওর নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হলো। এ উতবা একবার ব্যবসায়ী কাফেলার সরদার হয়ে সিরিয়া যাচ্ছিল। আবু লাহাব ওর গোলামদেরকে যারা উতবার সাথে যাচ্ছিল, উতবার নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার তাগিদ দিল এবং রাত্রে শয়ন কালে উতবাকে মাঝেখানে রাখার জন্য বললো। কাফেলা যাত্রা পথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন করতে হলো। আবু লাহাবের নির্দেশমত উতবাকে মাঝখানে রেখে সবাই ঘুমাচ্ছিল। ইত্যবসরে পাশের জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বের হয়ে এসে প্রত্যেকের মুখ শুঁকে ছেড়ে দিল কিন্তু উতবার মুখ শুঁকে ওকে ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে মেরে ফেললো। এতে বুঝা গেল, যে রাসুলে পাকের শানে বেআদবী কারীদের মুখ থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয়, যা জীব জন্তুরাও উপলব্ধি করতে পারে।

এবার এক মকবুল বান্দার ঘটনা শুনুনঃ একবার হযরত সফীনা (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম) কাফিরদের হাতে বন্দী হয়েছিল। কিছুদিন পর তিনি খবর পেলেন যে সে এলাকায় মুসলিম বাহিনী আগমন করেছে। সুযোগ পেয়ে রাত্রে জেলখানা থেকে পালিয়ে দৌঁড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পার্শ্ববর্তী জংগল থেকে এক বাঘ বের হয়ে আসলো। তিনি বাঘকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি রসূলের গোলাম, পথ হারিয়ে ফেলেছি'। এটা শুনে বাঘ লেজ নাড়তে নাড়তে ওনার অগ্রগামী হয়ে রাস্তা দেখিয়ে মুসলিম বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে চলে গেল। (মিশকাত শরীফ, কারামাত অধ্যায়)

এ দু' তিনটি ঘটনা ঈমানদারদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শান-মান বর্ণনা করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে এর শিক্ষা দেয়া চাই। সাধারণ

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মুসলমানদের সামনে এসব বিষয় তুলে ধরা ওয়ায়েজীনে কেরামের একান্ত কর্তব্য। এটা জানা দরকার যে হুযূর আলাইহিস সালামের ইজ্জত মানে ইসলামের ইজ্জত। কারণ ঘরের মালিকের সুনাম দ্বারা ঘরের সম্মান এবং যোগ্যকর্তার দ্বারা কর্মের সুনাম প্রকাশ পায়। উদহারণ্ব স্বরূপ, একটি সমাবেশে হিন্দু-মুসলমান ইহুদী, খৃষ্টান সুবাই একত্রিত হলো। হিন্দু উঠে বললো, আমাদের রামচন্দ্র এত শক্তিশালী যে সীতাকে বিবাহ করার জন্য একটি ভারী কামানকে দু'টুকরা করে ফেলেছিল। খৃষ্টান দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এমন শান ছিল যে তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে কালেমা পড়ায়ে ছিলেন। ইহুদী দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসা আলাইহিস সালামের এমন ক্ষমতা ছিল যে তিনি পাথরের উপর স্বীয় লাঠির আঘাত করে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান উঠে যদি মাওলভী ইসমাইল, মাওলভী খলীল আহমদ প্রমুখের মত বলেন- আমাদের নবী একজন অক্ষম বান্দা ছিলেন তাঁর দেয়ালের পিছনের জ্ঞানও তাঁর ছিল না, তাঁর জ্ঞান শয়তান ও মৃত্যুর ফিরিশতার জ্ঞান থেকে কম ছিল, তাহলে বলুন, এতে ইসলামের ইজ্জত বাড়লো, নাকি কমলো? যারা ওদের এ বক্তব্য শুনবে তারা দূর থেকে ইসলামকে বিদায়ী সালাম জানাবে। এ ধরনের অক্ষম ও অসহায় ব্যক্তির প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি কেউ এগিয়ে আসবে না। হ্যাঁ, এমতাবস্থায় আমাদের মত যদি কোন নবী প্রেমিক থাকেন তাহলে জটপট দাঁড়িয়ে বলবেন, হে হিন্দু মশায়, আপনিতো বললেন, রামচন্দ্র একটি ভারী কামানকে দু'টুকরো করেছে কিন্তু আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা দেখুন, তিনি তাঁর পবিত্র আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দু'টুকরো করেছিরেন। হে ঈসায়ী, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামতো প্রাণহীণ মৃতদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছেন কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীর খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা দেখুন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শুকনো লাকড়ি, জংগলের গাছপালা এবং কংকররাজি দ্বারা স্বীয় কলেমা পড়ায়েছেন। হে ইহুদী, হযরত মুসা আলাইহিস সালামতো পাথর থেকে পানি বের করেছেন কিন্তু আমাদের মাওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শান দেখুন, তিনি তাঁর পবিত্র

www.AmarIslam.com

আঙ্গুলসমূহ থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন।

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیا سے جھوم کر
ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جار اہ واہ

অ... পিপাসা কাতর সাহাবীগণ প্রিয় নবীর আঙ্গুলসমূহ হতে প্রবাহিত ঝর্ণাধারার পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। পাঁচ আঙ্গুল থেকে যেন রহমতের পাঁচটি নহর প্রবাহিত হলো।

মোট কথা, ইসলামের শান-শওকত দেখানোর জন্য ইসলামের প্রবর্তক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শান-শওকত প্রকাশ করা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু আফসোস, এ যুগের কিছু মুসলিম বেশধারী মুরতেদ এ রহস্য বুঝে না। শয়তান ওদেরকে যুক্তি দেখায় যে নবীগণের শান শওকত বর্ণনা করার দ্বারা আল্লাহকে হেয় করা হয়। এসব অতি বুদ্ধিমানরা ইবলিস তাওহীদকে ইসলামী তাওহীদ মনে করেছে এবং তাওহীদে খোদার জন্য তাওহীণে মুস্তাফা (নবীকে হেয় করা) জরুরী মনে করেছে। অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শানমান আল্লাহর কুদরতের বিকাশকারী। সাগরীদের যোগ্যতার দ্বারা উস্তাদের যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। জিনিসের সৌন্দর্যের মধ্যে প্রস্তুতকারকের প্রতিভা প্রকাশ পায়। যখন আল্লাহর মাহবুবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান গরিমার কথা মনে আসবে তখন অনায়সে মুখ থেকে বের হয়ে আসবে হে মাহবুব (সাঃ) আপনার সৃষ্টিকর্তার কুদরত কত যে অসীম তা আপনার মত সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পায়।

এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি 'শানে হাবীবুর রহমান ' ও 'জাআল হক' নামে দু'টি কিতার রচনা করেছি। খোদার ফজলে কিতাব দু'টি সুধী পাঠক সমাজের কাছে আশাতীত সমাদৃত হয়েছে। পাক-ভারত-বাংলার আনাচে কানাচে এ কিতাবদ্বয় পৌঁছে গেছে। সুন্নী জনতা ও ওলামায়ে কিরাম কিতাবদ্বয় পেয়ে আমাকে অশেষ দোয়া করেছেন এবং অগণিত চিঠি দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ কিতাবদ্বয়ের ব্যাপারে কোন দেওবন্দী ওহাবী আপত্তি করার সাহস পায়নি। বরং খোদার ফজলে অনেক দেওবন্দী কিতাবদ্বয় পড়ে দেওবন্দী চিন্তাধারা ত্যাগ করে সুন্নী জামাতে শামিল হয়েছে। এর জন্য

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আল্লাহর কাছে লাখো শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

'জাআল হক' গ্রন্থে বিতর্কিত প্রায় মাছায়েল সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে তিনটি বিষয় বাদ পড়েছে যেগুলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরী। এ বিষয় তিনটা হচ্ছে- সালতানতে মুস্তাফা, বিশ রাকাত তারাবীহ এবং নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া।

(১) সালতানতে মুস্তাফা অর্থাৎ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর রাজত্ব দেওবন্দী ওহাবীরা স্বীকার করতে রাজি নয়। তারা হুযূর আলাইহিস সালামের সমস্ত কামালাত যেভাবে অস্বীকার করে এটাকেও সে রকম অস্বীকার করে। কুরআন শরীফের যে সব আয়াতে মূর্তিদের অপারগতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নবীগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এবং মূর্তি পূজার আয়াতগুলো মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তারা সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। কুরআন মজিদে তারা শুধু এ আয়াতটি দেখতে পায়। قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (বলে দিন, আমি তোমাদের মত মানুষই)

(২) বিশ রাকাত তারাবীহঃ লা-মযহাবীরা, তারাবীহের নামায বিশ রাকাত পড়ে না। তারা আট রাকাত পড়ে। এ প্রসঙ্গে মওলভী রশীদ অহমদ সাহেবের লিখিত الرامى البخيح। গ্রন্থ খানায় যথেষ্ট ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে।

(৩) নবীগণ যে মাছুম অর্থাৎ নিষ্পাপ, সেটা ইদানীং কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না। কানপুরের এক ব্যক্তি এর বিরোধীতায় উঠে পড়ে লেগেছে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করছে। সে বলে যে, নবীগণ (নাউযুবিল্লাহ) গুনাহগার বরং মুশরিক ছিল, পরে তাওবা করেছেন।

আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমি অল্প সময়ে উক্ত তিন বিষয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী করে ফেল্লাম এবং 'জাআল হকে'র পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত করার মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু আমার বিশিষ্ট বন্ধু জনাব মন্সী আহমদ দীন সাহেব 'সালতানতে মুস্তাফা' বিষয়টি আলাদা পুস্তিকা হিসেবে অতি সত্বর প্রকাশ করার জন্য খুবই জোর দিলেন। অতএব আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিলাম। আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও স্বল্পবিদ্যার কারণে সাহস পাচ্ছিলাম না।

তবে আলা হযরতের নিম্নের কবিতাটা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে-

ٹوٹی اس بندھاتے یہ ھیں – چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں
ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں – ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں
فیض جمیل خلیل سے پوچھو – اگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں

অর্থাৎ আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। তিনি হতাশা ব্যক্তির মধ্যে আশা সঞ্চার করেন। স্তব্ধ হয়ে যাওয়া শিরা উপশিরাকে পুণরায় চালু করেন। ডুবন্ত নৌকাকে তিনি ভাসিয়ে তুলেন, দৌদুল্যমান ভিতকে সুদৃঢ় করেন এবং তিনি অগ্নিকুণ্ডকে বাগানে পরিণত করেন।

এ কাজ আমার যোগ্যতা বা শক্তির বদৌলতে হয়নি বরং সেই মাহবুবে খোদার করম দৃষ্টিতে সম্ভব হয়েছে।

تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک
میں نبی کس کو بناؤں جو حفاتم ہوجاؤں

অর্থাৎ আপনার ইচ্ছায় নগন্য মাটি পবিত্র বান্দায় পরিণত হয়। তাই সদা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। আপনি ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

বিষয়বস্তু অনুসারে এ পুস্তিকাটির নামকরণ করা হয়েছে। سلطنت مصطفے درمملکت کبریا (আল্লাহর সাম্রাজ্যে মুস্তাফা আলাইহিস সালামের রাজত্ব)। জাআল হক যে নিয়মে লিখা হয়েছে এটাও সেই একই নিয়মে লিখা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়কে দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব প্রমাণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধিতাকারীদের আপত্তি সমূহ ও এ সবের জবাব সন্নিবেশিত করা হয়েছে। وما توفيقى الا بالله

আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী উজানবী
মোহতামীম
মাদ্রাসায়ে গাউসীয়া নঈমীয়া, গুজরাত, পাঞ্জাব।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রথম অধ্যায়

স্থায়ী শান্তির অগ্রদূত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর হুকুমে উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার। তিনি খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আসমান, জমীন, বেহেস্ত, দোজখ, আল্লাহর আহকাম ও নেয়ামতের মালিক।

خالك كلّ نے اپ كو مالك كل نبا ذيا٠

دونوں جهان هيں آپ كے قبضه اختيار ميں

অর্থাৎ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সবছিুর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। উভয় জাহান আপনার কব্জায় ও কর্তৃত্বাধীন।

যাকে ইচ্ছে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর অনুগ্রহ দান করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে বঞ্চিত করতে পারেন। কারো জন্য যা ইচ্ছে হালাল এবং যা ইচ্ছে হারাম করতে পারেন। মোট কথা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উভয় জাহানের মালিক ও মওলা।

حكم نافذ ہے ترا سيف ترى خامه ترا

دم ميں جو چاہے كرے دور ہے شاہا ترا

অর্থাৎ আপনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সমস্ত ক্ষমতার উৎস। হুকুমজারী, তলোয়ার, কলম সব আপনার হাতে। মুহূর্তের মধ্যে আপনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন।

উপরোক্ত বক্তব্য শুনে আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় এবং তাদের ঈমান চাঙ্গা হয়ে উঠে। কিন্তু আফসোস, হিন্দু, খৃষ্টান বা অন্য কোন কাফির নয়, বরং মুসলমান নামধারী দেওবন্দী ওহাবীরা উপরোক্ত বক্তব্য শুনে জ্বলে পুড়ে কাল ছাই হয়ে যায়। একটি প্রবাদ আছে দাতা দান করে, কিন্তু ভাণ্ডার রক্ষক হিংসায় পিত্ত পেটে মরে। এ সব অতি বুদ্ধিমানদের কাছে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, আল্লাহ দাতা এবং তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গ্রহীতা, তোমরা জ্বলার কে?

www.AmarIslam.com

আমি প্রথমে দাতা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবো- তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাকে দিয়েছেন কিনা। এর পর সেই গ্রহীতা মাহবুব আলাইহিস সালামের কাছে আরয করবো, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি কি নিয়েছেন? সাহাবায়ে কিরাম থেকে জানতে চাইবো এ আদান-প্রদান সম্পর্কে তাঁদের অভিমত কি? অতঃপর সমগ্র উম্মতের ওলামায়ে কিরামের কাছে জানতে চাইবো- এ ব্যাপারে তাঁরা কি আকীদা পোষণ করেন? দেওবন্দী ওহাবীদেরকে এ ব্যাপারে কিছু বলার সুযোগ দিব। সর্বশেষে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে যাচাই করে দেখবো। সুতরাং আমার বক্তব্যকে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কুরআনী আয়াত দ্বারা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীছ দ্বারা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে মুহাদ্দেসীন, মুফাস্সেরীন ও ওলামায়ে উম্মতের উক্তি দ্বারা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিরোধিতাকারীদের বিভিন্ন উক্তি দ্বারা এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে যুক্তি ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উভয় জাহানের মালিক হওয়ার অর্থ এ নয় যে আল্লাহ কোন কিছুর মালিক রইলো না বরং হুযূরই সবকিছুর মালিক। এ অর্থও নয় যে হুযূর আলাইহিস সালাম আল্লাহর মত মালিক। এ রকম হলে বিশ্বের জন্য দু'জন স্বাধীন মালিক আছে বলে ধরে নিতে হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালার মালিকানা হাকীকী, চিরস্থায়ী অনাদি ও চিরন্তন এবং হুযূর আলাইহিস সালামের মালিকানা প্রদত্ত ও অস্থায়ী। উদহারণ স্বরূপ দুনিয়াবী বাদশাহ স্বীয় রাজ্যের মালিক, আমরা আমাদের ঘরবাড়ীর মালিক এবং হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম পৃথিবীর মালিক হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তায়ালা ও সব কিছুর মালিক নন বরং তিনি হচ্ছেন আসল মালিক, আমরা হলাম অপ্রকৃত মালিক, তাঁর মালিকানা স্বত্বাগত, আমাদের মালিকানা প্রদত্ত। অনুরূপ হুযূর আলাইহিস সালামের মালিকানা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের আয়াত দ্বারা হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব প্রমাণঃ

وَمَا نَقَمُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ (১)

(তাদের কাছে কি খারাপ লেগেছে? এটা নয়কি যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ অনুগ্রহে ওদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। পারা -১০, রুকু-১৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)ও লোকদেরকে ধনী ও সম্পদশালী করার ক্ষমতা রাখেন। অন্যদেরকে সম্পদশালী সেই করতে পারে, যিনি স্বয়ং সম্পদের মালিক। উল্লেখ্য যে فضله (তাঁরই অনুগ্রহে) শব্দটি হুযূরের বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা فضله শব্দেরঃসর্বনামটি দ্বারা হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا (২) حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ- اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ-

(কতইনা ভাল হতো যদি তারা সেটার উপর সন্তুষ্ট হতো, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে দিয়েছেন এবং বলতো আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। স্বীয় অনুগ্রহে আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন এবং তাঁর রসূলও। আমরা আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত। (পারা-১০, রুকু-৭)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দান করেছেন এবং করবেন। তিনিই দান করতে পারেন, যিনি দান করার ক্ষমতা রাখেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাই দান করেন, যা আল্লাহ দান করেন। কেননা উক্ত আয়াতে কোন কিছু প্রদান করাকে

উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই আল্লাহ যেহেতু সব কিছু দান করেন, সেহেতু হুযূরও সব কিছু দান করেন।

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (৩)

(হে মাহবুব! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমি আপনাকে কাউসার দিয়ে দিয়েছি।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে আল্লাহ তাআলা হুযূর আলাইহিস সালামকে কাউসার দান করেছেন। কাউসার দ্বারা বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন 'হাউজে কাউসার' প্রচুর কল্যাণ, অনেক উম্মত, মকামে মাহমুদ, শাফায়াতে কুবরা, অসংখ্য মুজেযা, দুনিয়াবী প্রভাব, রাজ্য বিজয়, সমগ্র সৃষ্টিকুলে প্রাধান্য, সমগ্র সৃষ্টি জগত ইত্যাদি। যে অর্থই গ্রহন করা হোক, আল্লাহ যে দিয়েছেন এবং অনেক কিছু যে দিয়েছেন, তা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। মাহবুব আলাইহিস সালাম গ্রহন করেছেন এবং দাতার কোন দান গ্রহণ করার দ্বারা গ্রহীতা এর মালিক হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তাছাড়া اَعْطَيْنَا অতীতকালবোধক ক্রিয়া। এর দ্বারা বুঝা যায় যে প্রদান করার কাজটা হয়ে গেছে এবং হস্তান্তরও হয়ে গেছে। সুতরাং হুযূর আলাইহিস সালামের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইসমাঈল দেহলভীর 'তকরিয়াতুল ঈমান গ্রন্থে' যে উল্লেখিত আছে- 'যার নাম মুহাম্মদ বা আলী, সে কোন কিছুর মালিক বা ক্ষমতার অধিকারী নয়" তা আল্লাহর বাণীর সরাসরি বরখেলাপ।

সূক্ষ্ম কথাঃ দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামতকে আল্লাহ তাআলা 'কলীল' অর্থাৎ খুবই সামান্য বলেছেন কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালামকে যা প্রদান করা হয়েছে, সেটাকে কছির (বেশী) নয় বরং 'কাউসার' (অনেক অনেক বেশী) বলেছেন। দুনিয়াতো আমাদের আকা মওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মালিকানার কোটি ভাগের এক ভাগও নয়।

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (৪)

(হে মাহবুব, আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।)

এ আয়াত থেকে এটা জানা গেল যে আল্লাহ তায়ালা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে বিজয় দান করেছেন। যদি এ বিজয় দ্বারা

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

রাজ্য জয় বুঝানো হয় তাহলে এতে হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা বিজয়ীকারী বিজিত রাজ্যের মালিক হয়ে যায়। আর যদি আয়াতে উল্লেখিত 'ফতেহ' শব্দের অর্থ করা হয় 'খুলে দেয়া' তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, হে মাহবুব! আমি আপনার জন্য বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছি। অর্থাৎ জান্নাত, শাফায়াত ও অন্যান্য নেয়ামতের দরজাসমূহ, যা অন্যদের জন্য বন্ধ ছিল, হুযূর আলাইহিস সালামের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

(৫) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

(হে মাহবুব! আপনার প্রভু আপনাকে অভাবগ্রস্থ পেয়েছেন। অতএব ধনী করে দিয়েছেন।)

(৬) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (হে মাহবুব, আপনার প্রভু আপনাকে অচিরে এতটুকু প্রদান করবেন, তাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবকে এতটুকু দান করেছেন যে তিনি উভয় জাহান থেকে বেনিয়াজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে আরও অনেক কিছু দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যখন আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিলেন এবং তাঁর মাহবুব নিয়ে নিলেন, তখন এমনিতেই মালিকানা প্রমাণিত হয়ে যায়। আয়াতদ্বয়ে এটা বলা হয়নি যে কতটুকু দিয়ে ধনী করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে কি দিবেন। এতে বুঝা যায় সব কিছু দিয়েছেন এবং আরও দিবেন। সৃষ্টি জগতের সম্প্রসারণের সাথে সাথে দানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(৭) وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

(হে মাহবুব, (আলাইহিস সালাম) আপনার প্রতি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে।)

এটা দুনিয়ার রীতি যে, সৌভাগ্যশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তি সম্পর্কে লোকেরা বলে যে অমুকের উপর আল্লাহর বড় মেহেরবানী। অনুরূপ আল্লাহও বলেছেন, হে মাহবুব আপনার উপর আল্লাহর বড় মেহেরবানী। লক্ষ্যনীয় যে

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র দুনিয়াকে নগন্য বলেছেন এবং দুনিয়া শব্দের অর্থই হলো অতি নগন্য বিষয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তিনি বড় অনুগ্রহ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াটা আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মালিকানার এক কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকে সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী দিয়েছিলেন। কিন্তু ওনার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেননি যে, ওনার প্রতি বড় মেহেরবাণী করেছেন। তাই বুঝা গেল যে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বের পরিধি আমাদের নবীর মালিকানা ও রাজত্বের একটি প্রদেশ বা একটি জিলা সদৃশ।

এটাও লক্ষ্যনীয় বিষয় যে হুযুর আলাইহিস সালাম শরীয়তের বিধি বিধানের মালিক। কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে ঐ পর্যন্ত গৃহীত হয় না, যতক্ষণ না হুযূর আলাইহিস সালাম পছন্দ করেন। হুযূর আলাইহিস সালাম হালাল হারামের মালিক ও পূর্ণ ইখতিয়ারের অধিকারী।

(৮) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

(হে মাহবুব, তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করে তাদেরকে পাক-পবিত্র করুণ এবং তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের আত্মার শান্তিদায়ক।)

এ পবিত্র আয়াতে হুযূর আলাইহিস সালামকে কয়েকটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, তওবাকারী সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ সম্পদের যে সদকা আপনার দরবারে পেশ করেছেন, তা গ্রহণ করে ওদেরকে পূতঃ পবিত্র করে দিন। দুই, তাদের জন্য দুআ করুণ। এতে প্রমাণিত হলো যে, সদকা যেটা একটি ইবাদত, তখনই আদায় হবে, যখন হুযুর আলাইহিস সালাম গ্রহণ করেন। যদি এ শর্তারোপ করা না হতো, সাহাবায়ে কিরাম যে কাউকে দিয়ে দিতে পারতেন। তাছাড়া শুধু ইবাদত দ্বারা কেউ পূত পবিত্র হবে না বরং হুযুরের মেহেরবানী দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। কেননা এ আয়াতে বলা হয়েছে যে এ সদকার বিনিময়ে আপনি ওদেরকে পবিত্র করুন। তিন, আল্লাহ

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তায়ালা হুযূর আলাইহিস সালামের শাফায়াত ব্যতিরেকে কাউকেই কিছু দান করবেন না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, ওদের জন্য দুআ করুন। আল্লাহতো ইচ্ছে করলে হুযূরের বিনা দুআয় ওদেরকে সবকিছু দিতে পারেন। কিন্তু দেননা। যখন মাহবুব বলেন, তখনই দেন। চার, সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের আমলের ব্যাপারে আশ্বস্থ হতে পারেন না যতক্ষণ না হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীকৃতি দেন। এ জন্যই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে আপনার দুআর দ্বারা ওদের মনে স্বস্তিবোধ হবে।

ہے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے

حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصرکی ہے

অর্থাৎ নবীর সুপারিশ ছাড়া কোন কিছু আদায় করা যাবে না। আল্লাহ তাঁর হাবীবের সুপারিশ ব্যতিরেকে কিছু দান করেন না।

(৯) وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

(তিনি (হুযূর আলাইহিস সালাম) মানুষের জন্য ঘৃণিত জিনিসসমূহ হারাম করেন)

(১০) وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

(কাফিরেরা ওসব জিনিসকে হারাম মনে করে না, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন)

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কেও হারাম করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। তিনি শরীয়তের বিধি-বিধানের মালিক। দেখুন, কুকুর, গাধা, বিড়াল, ইত্যাদি হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই, হুযূরের বাণী থেকেই আমরা তা জানতে পেরেছি।

(১১) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

(যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন সিদ্ধান্ত দেন, সে ব্যাপারে নিজস্ব কিছু বলার কোন মুসলমান পুরুষ ও মহিলার কোন অধিকার নেই।)

এ আয়াতের শানে নযুল হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর আযাদকৃত বিশিষ্ট খাদেম হযরত যায়েদ ইবনে হারেছ এর সাথে হযরত যয়নাব বিনতে হাজাশের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হযরত যয়নাব কোরাইশ বংশের সন্মানিত মহিলা ছিলেন। তাই ওনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে হাজাশ এ প্রস্তাবে অনীহা প্রকাশ করলেন। কেননা তাঁর বোন কোরাইশী ও খুবই সন্মানিতা ছিলেন এবং হযরত যায়েদ কুরাইশী ছিলেন না। বিবাহ শাদীতে সমগোত্রের প্রতি খেয়াল রাখা হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাইকে রাজি হতে হলো এবং বিবাহ হয়ে গেল। এতে বুঝা গেল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের জান মাল ও সন্তান সন্ততির মালিক এবং এমন মালিক যে তাঁর নির্দেশের মুকাবিলায় কারো নিজ জান মাল ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে কিছু বলার অধিকারও নেই। দেখুন, বিবাহে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার অনুমতি ও নিকট আত্মিয়ের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ বিবাহে কারো অসম্মতিকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এর কারণ হলো, সমস্ত মুসলিম পুরুষ হুযূরের গোলাম এবং সমস্ত মুসলিম মহিলা হুযূরের বাঁদী। বাঁদীকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে বিবাহ দেয়ার অধিকার মনিবের রয়েছে।

(১২) قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(আপনি বলে দিন, হে আমার ওসব বান্দাগণ, যারা নিজেদের জানের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ো না।)

এ আয়াতে হুযূর আলাইহিস সালামকে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানকে বান্দা অর্থাৎ গোলাম বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সবাইকে স্বীয় গোলাম সেই বলতে পারে- যিনি সবের মালিক। মছনবী শরীফে বর্ণিত আছেঃ

بنده خود خواند احمد در رشاد

جمله عالم بخوان قل یاعباد

অর্থাৎ হেদায়েত কালে হুযূর আলাইহিস সালাম আমাদেরকে তাঁর বান্দা বলেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বিশ্ব মুসলিমকে বান্দা বলে সম্বোধন করার

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْ اللّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ (১৩)

(হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দাও, যখনই তোমাদেরকে ডাকা হয়।)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামের আনুগত্য এবং তাঁর আহবানে যে কোন অবস্থায় হাজির হয়ে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এর কারণ হলো হুযূর আলাইহিস সালাম সবের মালিক। এ আয়াতের বিশ্লেষণ ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর রাজত্ব ও শান মান বর্ণনাতীত। তাঁর আগমনের সাথে সাথে নব বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, দুনিয়া বদলে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হুকুমতের নিয়মকানুন পরিবর্তন করে ফেলেছেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আগমনের আগে পৃথিবীতে হক আআলার 'মহাপরাক্রমশালী' গুণ বিরাজ ছিল। হুযূরের আগমনের পর তাঁর 'মহা করুণাময় ও ক্ষমাশীল' গুণ বিকশিত হলো। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, আগের উম্মতদের এক একটি গুণাহের জন্য আজাব অবতীর্ণ হয়েছে। কোন উম্মতের আকৃতি বিকৃতি করে দেয়া হয়েছে, কোন উম্মতের উপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, কোন উম্মতকে মহা প্লাবণ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আবার কোন উম্মতকে আবাসভূমি সহ উলটে দেয়া হয়েছে। কোন উম্মতকে বানর ও শুকরে পরিণত করে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের নবীর যুগে মক্কার কাফিরদের কামনার পরও কোন আজাব আসেনি। যখন মক্কার কাফিরেরা বললো- হে আল্লাহ ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর। এরপরও পাথর বর্ষিত হয়নি। কোন আজাবও নাযিল হয়নি এবং আল্লাহর গজবের সাগরও উৎলিয়ে উঠেনি বরং এ আয়াত নায়িল হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

(এটা আল্লাহর শান নয় যে ওদেরকে আজাব দেবে যতক্ষণ আপনি ওদের মধ্যে আছেন।)

সুবহানাল্লাহ! ওরাতো আজাবের উপযোগী ছিল কিন্তু রহমতে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খাতিরে আল্লাহ তাআলা আজাব নাযিল করেননি। আজ যদি আমারা নিজেদের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব, যে সব দোষ আগের উম্মতদের মধ্যে এক একটি করে ছিল, এখন এ সব দোষসমূহ একত্রিতভাবে আমাদের মধ্যে বিরাজমান। মাপে কম দেয়া, ছেলে ধর্ষন, সন্ত্রাস, লুঠতরাজ, মিথ্যা কথা বলা সব দোষ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের আকৃতি বিকৃতি হচ্ছেনা, না পাথর বর্ষিত হচ্ছে, না কোন সার্বজনিন আজাব আস্‌ছে। এটা একমাত্র শাহান শাহে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অবদান।

www.AmarIslam.com

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীছ শরীফের দ্বারা হুযূরের রাজত্ব প্রমাণ

(১) মিশকাত শরীফে 'ফযায়েলে সৈয়্যেদুল মুরসালীন' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান- পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের সমস্ত চাবি আমার কাছে আনা হয়েছে এবং আমাকে সোপর্দ করা হয়েছে।

এতে জানা গেল, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সমস্ত ধনভাণ্ডারের চাবি হুযূর আলাইহিস সালামকে প্রদান করেছেন। চাবি মালিককেই প্রদান করা হয়। লক্ষণীয় যে পৃথিবীতে সম্পদের কোন শেষ নেই। পৃথিবীতে যা কিছু আছে- মানুষ, জীবজন্তু, নানা রকম শস্য, ফলমূল, সোনা-চান্দি, মনিমুক্তা, হীরা-পান্না ইত্যাদি সবই পৃথিবীর সম্পদ এবং হুযূর আলাইহিস সালাম এ সবের মালিক।

(২) মিশকাত শরীফে একই অধ্যায়ে বর্ণিত আছে أُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ অর্থাৎ আমাকে দু'টি সম্পদ দান করা হয়েছে- একটি লাল ও একটি সাদা।

বুঝা গেল যে, হুযূরকে সমস্ত সোনা-চান্দি দান করা হয়েছে এবং হস্তান্তরও করা হয়েছে, যাতে মালিকানা প্রমাণিত হয়।

(৩) মিশকাত শরীফে আখলাকুন নবী শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে وَلَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبِ অর্থাৎ আমি যদি ইচ্ছে করতাম, সোনার পাহাড় আমার পিঁছে পিঁছে ঘুরতো।

বুঝা গেল, হুযুর আলাইহিস সালাম সর্বময় ক্ষমতা প্রাপ্ত মালিক। কিন্তু তা প্রকাশ করেন নি।

(৪) মিশকাত শরীফে العلم। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযুর আলাইহিস সালাম ফরমান- اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ অর্থাৎ আল্লাহ প্রদান করেন এবং আমি বন্টনকারী।

www.AmarIslam.com

এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ যাকে যেটা প্রদান করেন, সেটা হুযূরের বন্টনের দ্বারা পাওয়া যায়। আরও উল্লেখ্য যে, আল্লাহর দেয়া ও হুযূরের বন্টনের বেলায় কোন শর্তারোপ করা হয়নি- যুগের, জিনিসের বা গ্রহীতার কোন শর্ত নেই। আল্লাহ তাআলা যা প্রদান করেন, হুযূর আলাইহিস সালাম তা বন্টন করেন। আল্লাহতো প্রত্যেক জিনিসই প্রদান করেন। তাই হুযূরও প্রত্যেক জিনিসই বন্টন করেন। প্রত্যেক কিছু তিনিই বন্টন করেন, যিনি প্রত্যেক কিছুর অধিকারী। এতে হুযূরের মালিকানা ও কর্তৃত্ব অনায়াসে প্রমাণিত হয়ে যায়।

(৫) মিশকাত শরীফে السجود وفضله। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, একবার হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত রবীয়া ইবনে আবি কা'ব আসলামী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফরমালেন- سَلْ (আমার থেকে কিছু চাও) তিনি আরয করলেন اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ অর্থাৎ জান্নাতে আপনার সান্নিধ্যে থাকাটাই আপনার কাছে কামনা করছি। ইরশাদ ফরমান اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ (এটা ছাড়া আর আর কি চাও) হযরত রবীয়া আরয করলেন, আর কিছু চাই না, এটাই যথেষ্ট।

এ হাদীছে তিনভাবে হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব প্রমাণিত হয়- প্রথমতঃ হুযূর আলাইহিস সালাম বলেছেন, কিছু চাও অর্থাৎ যা খুশী তা চাও। নির্দিষ্ট করে বলেননি যে অমুক জিনিসটা চাও। এ রকম সেই বলতে পারেন, যার কর্তৃত্বাধীনে সব কিছু থাকে। হযরত রবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু)ও খুব চিন্তাভাবনা করে সেই অতুলনীয় জিনিসটা চাইলেন অর্থাৎ জান্নাত, তাও সেই সর্বোচ্চ জান্নাত যেথায় হুযূর আলাইহিস সালাম থাকবেন।

দ্বিতীয়তঃ হযরত রবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন اَسْئَلُكَ (আমি আপনার কাছে কামনা করছি) এ রকম বলেননি যে আমি আল্লাহর কাছে কামনা করছি এবং হুযূর (আলাইহিস সালাম)ও বলেননি যে এভাবে কামনা করায় তুমি মুশরিক হয়ে গেছ। এটা জানা কথা যে কোন কিছু চাওয়ার থাকলে মালিক থেকে চাওয়া হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, হুযূর আলাইহিস

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সালাম আল্লাহর প্রত্যেক কিছুর মালিক। তৃতীয়তঃ হুযূর আলাইহিস সালাম বলেছেন, আরও কিছু চাওয়ার থাকলে চেয়ে নাও। এতে বুঝা যায় তিনি জান্নাত ছাড়া আরও অনেক কিছু দিতে পারেন। কিন্তু হযরত রবীয়া আর কিছু কামনা করেননি। কারণ তিনিতো ফুল পেয়ে গেছেন, পাতার কি প্রয়োজন।

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے

دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

অর্থাৎ কেউ কাউকে কিছু দিতে চায় না। একমাত্র আমাদের নবী আলাইহিস সালাম অকাতরে দান করেন।

(৬) মিশকাত শরীফে المعجزات। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হযরত জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঘরে সামান্য আটা ও মাংসের মধ্যে হুযূর আলাইহিস সালাম থুথু মুবারক ফেললেন। এর বরকতে সেই সামান্য আটা ও মাংস অনেক লোক খেলেন কিন্তু মাংস ও আটার মধ্যে কোন কমতি হলো না। রন্ধনকারী হযরত জাবেরের স্ত্রীর কাছেও রান্না করতে কোন ক্লান্তি অনুভব হলো না।

(৭) একই অধ্যায়ে আর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন এক যুদ্ধে হুযূর আলাইহিস সালাম এক গ্লাস পানির মধ্যে হাত মুবারক রাখলেন। তখন আঙ্গুল সমূহ হতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো এবং পনেরশ লোক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন এবং অজু করলেন।

(৮) একই অধ্যায়ে আর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, হাসিবিয়ার কূপে পানি খুবই কম ছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম সেখানে একটি তীর ফেললেন। এতে সেই কূপের পানি অধিক হয়ে গেল।

(৯) আর এক হাদীছে আছে, হুযূর আলাইহিস সালাম এক বৃদ্ধা মহিলাকে ডেকে ওর মশকের মুখ সাহাবায়ে কিরামের জন্য খুলে দিলেন। সেই পানি সবার জন্য যথেষ্ট হলো। সবাই নিজ নিজ পাত্র ভরে নিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। কিন্তু মশক আগের মত পরিপূর্ণ রইলো।

www.AmarIslam.com

المعجزات। অধ্যায়ের উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে বুঝা গেল যে হুযূর আলাইহিস সালাম প্রত্যেক কিছুর মালিক। উপরোক্ত রেওয়ায়েত সমূহে দু'টি বিষয় লক্ষনীয়। একটি হচ্ছে হযরত জাবেরের ঘরে হুযূর আলাইহিস সালাম দাওয়াত ছাড়া অনেক মেহমান নিয়ে গেলেন, সেই বৃদ্ধা মহিলার মশকের পানি ওনার বিনা অনুমতিতে সবাইকে পান করালেন। অথচ কোন লোক অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে কাউকে নিয়ে যেতে পারেনা এবং মালিকের অনুমতি ব্যতীত ওর কোন জিনিস অন্যকে খাওয়াতে পারে না। উপরোক্ত আচরণ থেকে বুঝা গেল হুযূর আলাইহিস সালাম প্রত্যেক ব্যক্তির মালিক এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর গোলাম। মালিক স্বীয় গোলামের জিনিস ওর বিনা অনুমতিতে নিজে খেতে পারেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াতে পারেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আঙ্গুলসমূহ, মশক ও কূপে পানি কোত্থেকে আসলো, আসলে ঐ সময় ওগুলোকে হাউজে কাউসার ও জান্নাতের সলসবিলের সাথে সংযোগ করে দিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতেই সেই পানি সবাইকে পান করালেন। এ জন্যই হুযূরের আঙ্গুলের পানি জমজম কূপের পানি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয়েছে। বুঝা গেল, হুযুর আলাইহিস সালাম উভয় জাহানের নেয়ামত সমূহের মালিক। তিনি তাঁর গোলামদেরকে যেখানে ইচ্ছে জান্নাতের নেয়ামত খাওয়াতে পারেন।

(১০) মিশকাত শরীফে صلوة الخسوف শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন اِنِّی رَاَیْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهَا مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমি সেই চন্দ্রগ্রহণের নামাযে জান্নাত অবলোকন করেছি এবং এর ফলের গুচ্ছ স্পর্শ করেছি। যদি আমি সেই গুচ্ছ ছিঁড়ে নিতাম তাহলে আমরা সেটি কেয়ামত পর্যন্ত খেতে থাকতাম।

এতে বুঝা যায় মদীনা পাকে দাঁড়িয়ে জান্নাতের ফলের গুচ্ছ ছিঁড়ে সাহাবায়ে কিরামকে প্রদান করা হুযূর আলাইহিস সালামের জন্য অনুমোদিত ছিল কিন্তু তিনি নিজে ইচ্ছে করে ছিঁড়েননি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি দুনিয়াতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অবস্থান কালেও জান্নাতের প্রত্যেক জিনিসের মালিক ছিলেন।

(১১) মিশকাত শরীফে المعجزات। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, একটি ময়দানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হুযূর আলাইহিস সালামের প্রস্রাবের হাজত হয়। ময়দানের অদূরে দুটি বৃক্ষ খাঁড়া ছিল। পর্দার উদ্দেশ্যে হুযূর আলাইহিস সালাম বৃক্ষদ্বয়কে একটির সঙ্গে একটি লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর বৃক্ষদ্বয় আজ্ঞাবহ উটের মত হযূরের পিছে পিছে প্রস্রাব করার স্থানে চলে আসে এবং হুযূর বৃক্ষদ্বয়ের আড়ালে প্রস্রাবের কাজ সারলেন।

(১২) শামীতে المرتدين। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালামের মুবারক হাতের স্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি হযরত আমেনা খাতুন ও হযরত আব্দুল্লাহ (হুযূরের মাতা-পিতা)কেও জীবিত করে মুসলমান করেন।

(১৩) একই অধ্যায়ে শামীতে আরও বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাদি আল্লাহ আনহু) স্বীয় আসরের নামায হুযূর আলাইহিস সালামের নিদ্রার জন্য কুরবান করে দিলেন। ঘটনাটি হলো- হুযূর আলাইহিস সালাম আসরের নামায পড়ে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর উরুর উপর মাথা মুবারক রেখে বিশ্রাম নিলেন। হযরত আলী তখনও আসরের নামায পড়েনি। এ দিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি নিশ্চুপ বসে রইলেন। কেননা তিনি মনে করলেন যে নামাযের জন্য দাঁড়ালে হুযূরের আরামের ব্যাঘাত হবে। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে গেল এবং হযরত আলীর আসর নামায কাজা হয়ে গেল। হযূর আলাইহিস সালাম নিদ্রা থেকে উঠে সূর্যকে ফিরায়ে আনলেন এবং অতিবাহিত সময়কে আসরের সময়ে পরিণত করলেন এবং হযরত আলী আসর যথাসময়ে আদায় করলেন।

উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত থেকে বুঝা গেল যে, হুযূর আলাইহিস সালাম উভয় জাহানের মালিক। এর সমর্থনে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, মৃত্যুর পর কারো ঈমান কবুল হয় না এবং সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর নামায কাযা হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু সেই শাহান শাহ

(আলাইহিস সালাম) এর রাজত্বের শান দেখুন, স্বীয় মা-বাপকে ওনাদের ওফাতের পর ঈমান দান করে সাহাবী বানিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা তা গ্রহণ করেছেন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহ আনহু) এর কাযা হয়ে যাওয়া নামায যথাসময়ে আদায় করার ব্যবস্থা করে দিলেন। এটা একমাত্র হযরত আলীর জন্যই করা হয়েছিল। অন্যরা যারা যথাসময়ে নামায পড়ে নিয়েছিলেন, তাঁদেরকে পুণরায় পড়তে বলা হয়নি। দুই, সূর্য আসমানে থাকে এবং মৃতদের রূহ রূহের জগতে পাখী হিসেবে বিরাজ করে। কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব ওদের উপরও কার্যকর। এদিক থেকে ইশারা করা হলো- ওদিক থেকে আনুগত্য প্রকাশ করলো, ডুবন্ত সূর্য পুণরায় উদিত হলো এবং মা-বাপের রূহ সেই রূহের জগত থেকে ফিরে আসলো।

اشارے سے چاند چیر دیا - چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا
گئے ہوئے دن کو عصر کیا - یہ تاب وتواں تمہارے لئے

অর্থাৎ ইশারায় চাঁদকে দিখণ্ডিত করা, ডুবন্ত সূর্যকে ফিরায়ে আনা, অতিবাহিত সময়কে পুণরায় আসরের সময় পরিণত করা আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জন্যই শোভা পায়। কারণ তাঁর রাজত্ব সর্বত্র বিরাজমান।

(১৪) মিশকাত শরীফে المعجزات। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী জুমাবার খুতবার সময় হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলেন। হুযূর আলাইহিস সালাম মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন। খুতবা শেষ হবার আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পরবর্তী জুমাবার পর্যন্ত লাগাতার বৃষ্টিপাত হতে রইলো। পুণরায় সেই সাহাবী আরয করলেন, বৃষ্টি যথেষ্ট হয়েছে, ঘরবাড়ী পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। হুযূর আলাইহিস সালাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন। এতে মেঘমালা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ, আমাদের উপর বৃষ্টি আর নয়। আশে পাশে হোক। যে রকম প্রার্থনা করলেন সেই রকমই হলো।

এতে বুঝা গেল মেঘমালার উপরও হুযূর আলাইহিস সালামের হুকুমত

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চলে। মৌসুমী বায়ু বা ঋতুর কোন শর্ত নেই। ইশারা পেলে চলে আসে আবার ইশারা পেলে ফিরে যায়।

(১৫) মিশকাত المعجزات। অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে, একবার হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর একটি জেদী ঘোড়ায় আরোহণ করে ছিলেন। এর পর থেকে সেই ঘোড়াটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। আর কখনো জেদ করেনি।

বুঝা গেল, জীব জন্তুর উপরও হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব চলে।

(১৬) সেই একই মিশকাতের المعجزات। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম ওকে ডান হাতে খেতে বললেন। সে লজ্জিত হওয়া থেকে রেহাই পাবার জন্য আরয করলো, আমার ডান হাত অকেজো। হুযূর আলাইহিস সালাম ফরমালেন, ঠিক আছে, আজ থেকে অকেজো হয়ে গেল। ঠিকই ঐ দিন থেকে ওর হাত এমন অকেজো হয়ে গেল যে এরপর আর কোন দিন সে হাতটি মূখ পর্যন্ত আনতে পারেনি।

(১৭) মিশকাত শরীফে المعجزات। অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালামের উপর মেঘমালা ছায়া দান করতো। একবার হুযূর আলাইহিস সালাম পাদ্রী বহিরার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে তশরীফ নিয়ে গেলেন। একটি বৃক্ষের ছায়াতলে এ দাওয়াতের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ছায়াতল আমন্ত্রিত মেহমানে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম তশরীফ আনার সাথে সাথে সেই বৃক্ষ ঝুকে হুযূরের উপর ছায়া দান করলেন।

আমাদের সমাজে রাজা বাদশাহের মাথার উপর চাকর বাকরেরা রৌদ্র তাপে ছাতা ধরে। কিন্তু সেই বাদশাহের সালাতানত (রাজত্ব) বৃক্ষরাজি ও মেঘরাশির উপরও কার্যকর। এরা স্বীয় মালিককে দেখলে সাথে সাথে খেদমতে নিয়োজিত হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

(১৮) মিশকাত শরীফ المعجزات। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালাম একটি দুর্বল ছাগীর স্তনে হাত মুবারক লাগিয়ে ওটা থেকে এতটুকু দুধ বের করলেন যে তাঁর সাথে আগত সমস্ত লোক দুধ পানে পরিতৃপ্ত হলেন এবং ছাগীর মালিক সেই মহিলার পাত্র দুধে পরিপূর্ণ হলো।

বুঝা গেল, আমাদের হুযূর আলাইহিস সালাম এমন শাহান শাহ যে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিজ মালিকানা প্রকাশ করেন। সব জায়গায় তাঁর শাহী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত।

(১৯) মিশকাতে কারামাত শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হযরত আনস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বাগানে একবার হুযূর আলাইহিস সালাম তশরীফ নিয়ে ছিলেন। এর পর থেকে ওনার বাগানে বছরে দু'বার ফল উৎপন্ন হতে থাকে।

(২০) হাকিম, ইবনে আদি ও আসাকর (রাদি আল্লাহু আনহুম) হযরত আবু হুরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে রেওয়ায়েত করেন-

اِشْتَرٰى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ يَوْمَ رُوْمَةَ وَيَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ

অর্থাৎ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) দুটি কাজ দ্বারা হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে জান্নাত খরিদ করেছেন। এক, যখন মদিনা মনোয়ারায় 'রোমা' কূপ ব্যতীত কোন কূপ ছিল না, তখন হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) সেটা খরিদ করে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। দুই, তবুক যুদ্ধের সময় মুসলমান যোদ্ধাগণ যখন সাজ সরঞ্জামহীন অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযুর আলাইহিস সালামের ঘোষণা মুতাবেক রোমা কূপের বিনিময়ে তাঁর থেকে জান্নাত ক্রয় করে নিলেন এবং হুযূর বিক্রি করে দিলেন। জান্নাত সেই বিক্রি করতে পারে, যিনি হয়তো জান্নাতের মালিক, অথবা মালিক কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

(২১) ইমাম আহমদ আবু নঈম এবং ইবনে হাব্বান হযরত জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমানঃ

أُعْطِيْتُ مَقَالِيْدَ الدُّنْيَا عَلٰى فَرَسٍ اَبْلَقَ جَاءَنِىْ بِهَا جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ

অর্থাৎ আমাকে দুনিয়ার চাবি সমূহ প্রদান করা হয়েছে। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম সেই চাবিসমূহ সাদা-কালো ঘোড়ার উপর রেখে আমার কাছে এনেছেন।

(২২) আবু নঈম ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে হযরত আমেনা খাতুন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন হুযূর আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হন, তখন তিনি সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। সেই সময় একটি সাদা মেঘ এসে হুযূরকে আমার থেকে অদৃশ্য করে ফেলে। কিছুক্ষণ পর পুণরায় আবির্ভূত হন। তখন আমি দেখি হুযূরের হাত মুবারকে একগুচ্ছ চাবি এবং অদৃশ্য থেকে কে যেন বলছিল, বিজয় ও নবুয়াতের চাবিসমূহ হুযূর আলাইহিস সালাম হস্তগত করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়বার পুণরায় মেঘ এসে হুযূরকে আমার থেকে অদৃশ্য করে ফেলে। কিছুক্ষণ পর পুণরায় দৃশ্যমান হল। তখন অদৃশ্য থেকে কেউ বলছিলেন-

بَخٍ بَخٍ قَبَضَ مُحَمَّدٌ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا لَمْ يَبْقَ خَلْقٌ مِنْ اَهْلِهَا اِلَّا دَخَلَ فِىْ قَبْضَتِهٖ-

সাবাস, সাবাস, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সমগ্র দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দুনিয়াতে এমন কোন মখলুক নেই যেটা হুযূরের কর্তৃত্বাধীন আসেনি।

এ রেওয়ায়েতের সমর্থনে বোখারী শরীফের সেই হাদীছ রয়েছে, যেটা আমি মিশকাতের বরাত দিয়ে আলোচ্য পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি। তাছাড়া কুরআনের আয়াত اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ (আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।) এর মধ্যে উপরোক্ত হাদীছের প্রতি জোড়ালো সমর্থন রয়েছে।

তাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিকূলে হুযূরের হুকুমত রয়েছে। আরও অনেক হাদীছ পেশ করা যায় তবে ঈমাদারদের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে পার্থিব জিনিস সমূহের উপর হুযুর আলাইহিস সালামের রাজত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। এবার ওসব হাদীছসমূহ শুনুন, যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম) শরীয়তের যাবতীয় আহকামেরও মালিক। তিনি কারো জন্য ইচ্ছে করলে হালালকে হারাম, হারামকে হালাল করতে পারেন এবং কুরআনী আহকামকে পরিবর্তন করতে পারেন।

(২৩) মিশকাত শরীফে কিতাবুল হজ্বের শুরুতে বর্ণিত আছে, একবার হুযূর আলাইহিস সালাম ফরমালেন, হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ । অতএব হজ্ব করিও। কোন একজন আরয করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ প্রতি বছর হজ্ব করা ফরজ? হুযূর আলাইহিস সালাম ফরমালেন, আমি যদি এখন হ্যাঁ বলে দিতাম, তাহলে প্রতি বছরই হজ্ব ফরজ হয়ে যেত এবং প্রত্যেককে বছর বছর হজ্ব করতে হতো।

বুঝা গেল, তাঁর 'হ্যাঁ' বলার মধ্যে তাসীর রয়েছে। সব কিছু নিয়ম কানুনের আওতাধীন। কিন্তু খোদায়ী কানুন হুযূর আলাইহিস সালামের ওষ্ঠ মুবারক নড়ার অপেক্ষায় থাকে। যেটাই তাঁর মুখ মুবারক থেকে বের হয় সেটা খোদায়ী কানুন হয়ে যায়।

(২৪) মিশকাত শরীফে قيام شهر رمضان অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালাম তারাবীহের নামায জামাত সহকারে কয়েক দিন পড়ে ছেড়ে দেন এবং ত্যাগ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি সব সময় এভাবে পড়লে এটা তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, যা তোমাদের জন্য কষ্টকর হবে।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এতে বুঝা গেল যে, হুযূর আলাইহিস সালামের আমলও খোদায়ী কানুন হয়ে যায়।

(২৫) মিশকাত শরীফে مناقب অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, এক বাঁদী হুযূর আলাইহিস সালামের কাছে আরয করলো, আমি মানত করেছিলাম যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যুদ্ধ থেকে সহীহ সালামতে ফিরায়ে আনেন তাহলে আমি আপনার সামনে দফ বাজাবো ও গান করবো। হুযূর আলাইহিস সালাম ফরমালেন, ঠিক আছে, বাজাও। অতঃপর সে দফ বাজালো।

দেখুন গান-বাজনা নাজায়েয কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালাম একটি বিশেষ সময়ে সেই বাঁদীকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

(২৬) মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে ঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ عَلَى اَنَّهُ لَا يُصَلِّىْ اِلَّا صَلٰوتَيْنِ فَقَبِلَ ذَالِكَ مِنْهُ

অর্থাৎ একব্যক্তি হুযূর আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থিত হলো এবং এ শর্তে ঈমান আনলো যে সে মাত্র দু'ওয়াক্ত নামাযই পড়বে।

দেখুন মুসলমানদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। কিন্তু সেই ব্যক্তির জন্য হুযূর আলাইহিস সালাম তিন ওয়াক্ত মাফ করে দিলেন। (আল-আমন ওয়ার উলা থেকে সংগৃহীত)

অতএব বুঝা গেল যে, হুযূর আলাইহিস সালাম শরীয়তের মালিক।

(২৭) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মেরকাতে مناقب اهل البيت শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) দ্বিতীয় বিবাহ করার মনস্থ করলে, হুযূর আলাইহিস সালাম ফরমালেন, আলীর জন্য এর অনুমতি নেই। তবে যদি সে এ রকম করতে চায় তাহলে ফাতেমাকে তালাক দিয়ে দিক। অতঃপর বিবাহ করুক।

লক্ষ্য করুণ, কুরআন শরীফে ইরশাদ ফরমান-

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

(তোমরা ইচ্ছে করলে দুই, তিন এবং চার বিবাহ করতে পার) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পুরুষের জন্য চার জন পর্যন্ত বিবাহ করা জায়েয। কিন্তু হযরত আলীর জন্য হযরত ফাতিমার বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি নেই।

একই জায়গায় মেরকাতে আরও উল্লেখিত আছে-

فِيْهِ تَحْرِيْمُ اِيْذَائِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكُلِّ حَالٍ وَعَلٰى كُلِّ وَجْهٍ وَاِنْ تَوَلَّدَ الْاِيْذَاءُ مِمَّا كَانَ اَصْلُهٗ مُبَاحًا وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালামকে মনোকষ্ট দেয়া হারাম, যদিওবা সেটা কোন হালাল কাজের দ্বারা হয়ে থাকে। সেটা হুযূর আলাইহিস সালামের একান্ত বৈশিষ্ট্য। তাই হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর বর্তমানে আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ হারাম ছিল।

(২৮) বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড কিতাবুল সোলেহের শুরুতে বর্ণিত আছে, একবার হুযূর আলাইহিস সালাম মুসলমানদের মধ্যে আপোশ-মীমাংসার জন্য কোন এক জায়গায় গিয়েছিলেন। হুযুর তথায় পৌছার আগে নামাযের সময় হওয়ায় হযরত বেলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) আযান দিলেন এবং হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদ্বি আল্লাহু আনহু) কে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করলেন। জামাত শুরু হয়ে গেল। ইত্যবসরে হুযূর আলাইহিস সালাম তশরীফ আনলেন। মুক্তাদীগণ তালি বাজিয়ে হযরত ছিদ্দিকে আকবরকে হুযূরের আগমনের খবর দিলেন। সাথে সাথে ছিদ্দিকে আকবর পিছনে সরে এসে মুক্তাদী হয়ে গেলেন এবং হুযুর আলাইহিস সালাম ইমাম হলেন।

নামাযের সময় অন্য যে কেউ আসলে যেখানে জায়গা পায়, সেখানে দাঁড়াতে হয় কিন্তু আকা মওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম) এর শান দেখুন; তিনি (দঃ) জামাত কায়েম হওয়ার পরও তশরীফ আনলে নামাযরত

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ইমামের ইমামতি বাতিল হয়ে যায় এবং তিনিই ইমাম হন। এতে বুঝা যায় তিনি শরয়ী আহকামের মালিক।

(২৯) বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড مـرض الخـمـس অধ্যায়ে একটি দীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন আমি কারো উত্তরাধিকারী নই এবং আমারও কোন উত্তরাধিকারী নেই। অথচ মীরাছ বন্টন কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু এ মীরাছ থেকে হুযূর আলাইহিস সালাম নিজেকে ব্যতিক্রম বলেছেন। তাই কেউ হুযূরের মীরাছ পান নি। এতেও প্রমাণিত হয় যে তিনি (দঃ) শরীয়তের আহকামের মালিক।

(৩০) বুখারী শরীফের ২য় খণ্ড কিতাবুল তাফসীরে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত খযিমা আনসারী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর একক সাক্ষ্যকে দু'সাক্ষ্যের বরাবর ঘোষণা করেছেন। ঘটনা হচ্ছে, হুযূর আলাইহিস সালামের কাছে সাওয়া বিন হারেছ নামে এক বেদুইন একটি ঘোড়া বিক্রি করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে অস্বীকার করে বললো, আমি আপনার কাছে ঘোড়া বিক্রি করিনি। আপনি ক্রয় করে থাকলে কোন সাক্ষী হাযির করুন। আল্লাহর শান, এ ঘোড়া ক্রয় করার সময় হুযূর একাই ছিলেন। কিন্তু ঘটনার বিবরণ শুনে হযরত খযিমা আরয করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ ঘোড়া আপনি খরিদ করেছেন, আপনি সত্যবাদী এবং এ বেদুইন মিথ্যুক। হুযূর আলাইহিস সালাম ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ, তুমিতো আমাদের বেচা কেনা দেখনি। হযরত খযিমা আরয করলেন, আমি আপনার পবিত্র মুখ থেকে শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছি। ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমিতো আপনার পবিত্র মুখে শুনে আল্লাহর একত্ব, জান্নাত, দোযখ, কিয়ামত ইত্যাদি সব কিছুর সাক্ষ্য দি এবং বলি اَشْـهَـدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশহাদুআন লা ইলাহা ইল্লাহ), এ ঘোড়াতো ওগুলো থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওনার এ বক্তব্য হুযূর আলাইহিস সালামের এতই মনঃপূত হলো যে ওনার একক সাক্ষ্য দু'সাক্ষ্যের সমতুল্য করে দিলেন। লক্ষ্য করুন, কুরআনের হুকুম হচ্ছে وَاشْـهِـدُوْا ذَوَىْ عَـدْلٍ مِّـنْـكُمْ (তোমরা দু'জন সাক্ষী ঠিক কর) কিন্তু খযিমার বেলায় ওনার একক সাক্ষ্যকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমতুল্য করে

দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর আলাইহিস সালামের এ অধিকারও রয়েছে যে তিনি যাকে ইচ্ছে করেন, কুরআনী হুকুমের আওতামুক্ত করতে পারেন।

(৩১) বুখারী শরীফের একই অধ্যায়ে تُرْجِىْ مَنْ تَشَـاءُ এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহ আনহা) হুযূর আলাইহিস সালাম সমীপে আরয করলেন مَـا اَرٰى رَبَّكَ اِلَّا يُسَـارِعُ فِىْ هَـوَاكَ (আমি দেখতেছি যে, আপনার প্রভূ আপনার মনোরঞ্জনের জন্য তৎপর) এতে বুঝা যায় যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুবের বাসনাকে শরয়ী কানুনে পরিণত করেন।

(৩২) একবার হুযূর আলাইহিস সালাম উম্মে আতিয়াকে বিলাপ করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন অথচ বিলাপ শরীয়ত অনুযায়ী হারাম। (মুসলিম শরীফ)

(৩৩) হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) কে অনুমতি দিলেন যে হযরত ফাতেমার মৃত্যুর পর তিনি যেন ওনাকে গোসল দেন। অথচ স্বামী স্বীয় মৃত স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে না। কেননা স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। (শামী)

(৩৪) হযরত ছিদ্দিকে আকবরকে নাপাক অবস্থায় মসজিদে আসা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অথচ নাপাক ব্যক্তির বিনা গোসলে মসজিদে আসা নিষেধ।

(৩৫) এক ব্যক্তিকে ওর কাফফারার সাদকা ওকেই খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

(৩৬) মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, একবার হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন যে পবিত্র মক্কা শরীফে কোন কিছু কাঁটা ছেঁড়া যাবে না এবং এখানকার প্রাণীকে বিরক্ত করা যাবে না। হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ! আযখার (কাঁটাদার ঘাস) কাটার অনুমতি দেয়া হোক। কেননা এ ঘাস ঘরের চালে দেয়া হয় এবং কামারের ভাটিতে কয়লার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ফরমালেন, ঠিক আছে, আযখার ঘাস কাটার অনুমতি দেয়া গেল। এ ঘাস পবিত্র মক্কার জমীন থেকে কেটে নিয়ে

যেতে পারবে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র মুখ থেকে যেটাই বের হয় সেটাই আল্লাহর কানুন।

(৩৭) হুযূর আলাইহিস সালাম হিযরত কালে হযরত সুরাকা (রাদি আল্লাহু আনহু)কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমার হাতে পারস্য রাজ কিসরার সোনার কংকন দেখ্‌তেছি। তাঁর এ ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত্‌ কালে পারস্য রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয় এবং কিসরার কংকন হযরত সুরাকার হাতে পরানো হয় এবং সেটা তাঁর হাতেই থাকতো। দেখুন, পুরুষের জন্য সোনা পরিধান করা হারাম কিন্তু হুযরত সুরাকার জন্য সেই কংকন জায়েয হয়ে গেল।

(৩৮) বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত কাব (রাদি আল্লাহু আনহু) এর তওবার কাহিনী প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে যখন হযরত কাব বিন মালেককে দরবারে মুস্তাফায় অভিযুক্ত করা হয়, তখন ওনার স্ত্রীগনকে নির্দেশ দেয়া হলো তোমাদের স্বামী যেন তোমাদের কাছে না আসে এবং মুসলমানগণকে বলা হলো কেউ যেন ওনার সাথে কথাবার্তা না বলে এবং ওনাকে যেন সালাম না করে । তাই সেই বয়কটের সময় হুযূরের নির্দেশে হযরত কাবের স্ত্রীগণ ওনার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছিল। অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান-

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

(তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত বিশেষ। তাই তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে গমন করতে পার।)

কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালামের নির্দেশে হযরত কাবকে কুরআনের এ সার্বজনিন হুকুম থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এ শাস্তি ও নিষেধাজ্ঞা যদি স্থায়ীভাবে থাকতো তাহলে হযরত কাবের স্ত্রীগণ তাঁর জন্য স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যেত।

(৩৯) মিশকাত শরীফ المعجزات। অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফের

বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম) হযরত আবু হুরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কম্বলের উপর কিছু পড়ে ফুঁক দিলেন। হযরত আবু হুরাইরা সেই কম্বল বুকে লাগালেন। এর ফলে তাঁর স্মরণ শক্তি এত জোড়ালো হয়ে গেল যে তিনি কখনও কোন কথা ভুলতেন না। এ জন্যই প্রায় দু'লাখ হাদীছ তাঁর থেকে বর্ণিত আছে। স্মরণ শক্তি হচ্ছে মানুষের আভ্যন্তরীন শক্তি। আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সর্ব বিষয়ে হুযূর আলাইহিস সালামের কর্তৃত্ব রয়েছে।

এ ধরনের আরও অনেক হাদীছ রয়েছে তবে বিবেকবানদের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওলামায়ে উম্মতের উক্তি সমূহ

সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী সব সময় এ ব্যাপারে একমত যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম) উভয় জাহানের মালিক। এ জন্যই সাহাবায়ে কিরাম হুযূরের কাছে জান্নাত চেয়েছেন এবং দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হাদীছের বরাত দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হুযূরের যুগে কারো কোন অপরাধ হলে মাফ চাওয়ার জন্য হুযূরের দরবারে আসতেন, যেমন মিশকাত শরীফে কিতাবুল হুদুদে বর্ণিত আছে, হযরত যায়েদ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর একটি শরয়ী অপরাধ হয়েছিল। তাই তিনি বারগাহে নবুয়াতে এসে আরয করলেন طَهِّرْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ।অর্থাৎ হে আল্লাহর রসূল! হে আল্লাহর হাবীব, আমাকে পবিত্র করে দিন।

একই মিশকাতে التصاوير। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) আরয করলেন اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট তাওবা করছি।

মোট কথা প্রত্যেকে মসীবত দূর করা ও আল্লাহর রহমত কামনা করার জন্য হুযূর আলাইহিস সালামের দরজায় ধর্না দিতেন এবং হুযূরও ওনাদেরকে এরকম বলতেননা যে আমিতো তোমাদের মত অক্ষম বান্দা, আমার কাছে কেন প্রার্থনা করছ? মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর বরং ওনাদের আর্জি গ্রহণ করতেন এবং ওনাদের হাজত পূর্ণ করে দিতেন। না করবেনইবা কেন? সাহাবায়ে কিরাম হুযূরের দরবারে এমনিতে আসতেন না বরং ওনাদেরকে ও সমগ্র জগতবাসীকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন- প্রত্যেক মসীবতের সময় নবীর কাছে যাও। যেমন আল্লাহ তায়ালা ফরমান-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ وااللّٰه
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

(হে হাবীব, যদি এ সব লোক কোন সময় নিজেদের প্রতি জুলুম করে

আপনার দরবারে আসে; অতঃপর আল্লাহর কাছে মাফ চায় এবং আপনি তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু রূপে পাবে।)

এ আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ আমার কিতাব শানে হাবীবুর রহমান ও জাআল হকে দেয়া হয়েছে। এদিকে তো বিপদগ্রস্তদেরকে বলা হলো-যাও, আমার মাহবুবের কাছে কামনা কর আর ওদিকে দয়ালূ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম) কে বলা হয়েছে وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَاتَنْهَرْ অর্থাৎ হে হাবীব কোন সাহায্য প্রার্থীকে বিমুখ করো না, বরং কিছু দিয়ে বিদায় কর।

কোন এক হিন্দি কবি খুবই সুন্দর বলেছেন-

لج پال پریت کو توڑت ناہیں
جو ہاتھ پکڑیں چھوڑت ناہیں
گھر آئے کو خالی موڑت ناہیں
لج پال پریت کو توڑت ناہیں

অর্থাৎ লজপালের ভালবাসা ভাঙ্গা সম্ভব নয়। যে হাত ধরে সেটা ছাড়ে না। ঘরে আসলে কেউ খালি মুখে ফিরে যেতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কিরাম হুযূরকে মালিক বলে স্বীকার করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের যুগের পর সারা জাহানের ওলামায়ে কিরাম, মশায়েখে এজাম এবং সর্ব সাধারণ মুসলমানগণ হুযূর আলাইহিস সালামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে আসতেছে। তাঁদের রচিত বিভিন্ন গজল, কসীদা, অজীফা ও আমলের মধ্যে এর প্রমাণ রয়েছে। তাঁদের কিতাবসমূহে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে হুযূর আলাইহিস সালাম উভয়জাহানের মালিক। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি কিতাবের উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখিত হলোঃ

(১) আশয়াতুল লুমআত গ্রন্থে السجود। অধ্যায়ে হযরত রবীয়া ইবনে কাব (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেনঃ

معلوم می شود کہ کارہمہ بدست ہمت وکرامت اوست ہرچہ خواہد ہرکہ رانجوا ہد بہ اذن پرور دگار خود بد ہدے

اگر خیریت دنیا وعقبی آرزو داری

بدرگا ہش بیا وہرچہ می خواہی تمنا کن

অর্থাৎ সমস্ত কাজ হুযূর আলাইহিস সালামের হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছে আল্লাহর হুকুমে প্রদান করেন। যদি উভয় জাহানের কল্যাণ চাও, তাহলে হুযূরের বারগাহে হাজির হও এবং যা কাম্য চেয়ে নাও।

(২) মেরকাত শরহে মিশকাতে সেই একই হাদীছের ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী (রঃ) একই বক্তব্য পেশ করার পর বলেন- فَيُعْطِى لِمَنْ يَّشَاءُ হুযূর যাকে ইচ্ছে দান করেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় মীমাংসা করে দিল যে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক কিছুর মালিক হুযূর আলাইহিস সালাম। সব কিছু তাঁর থেকে প্রার্থনা করুন। ইজ্জত, ঈমান, জান্নাত, আল্লাহর রহমত যা ইচ্ছে তা কামনা করুন।

(৩) তফসীরে কবীর তৃতীয় খণ্ড সাত পারার সূরা আনামের আয়াত وَلَوْ اَشْرَكُوْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ এর ব্যাখ্যায় ইমাম ফখর উদ্দীন রাযী (কুঃ সিঃ) বলেন, নবীগণকে আল্লাহ তায়ালা এতটুকু মায়ারেফারের জ্ঞান দান করেছেন যে তাঁরা সৃষ্টি কূলের আভ্যন্তরীণ ও আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং বাহ্যিক বিষয়ের উপর রাজত্ব করেন। এখানে মখলুক শব্দ বলা হয়েছে, যা আরশ ফরশ সব কিছু বুঝায়। অতএব সব কিছুর উপর হুযূরের হুকুমত রয়েছে।

(৪) ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'আল জাওয়াহেরুল মুনাজ্জেম' গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় বলেন-

هُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ الَّذِىْ جَعَلَ خَزَائِنَ كَرَامَتِهٖ وَمَوَاعِدَ نِعَمِهٖ طَوْعَ يَدَيْهِ وَاِرَادَتِهٖ يُعْطِىْ مَنْ يَّشَاءُ مَايَشَاءُ

হুযূর (দঃ) আল্লাহ তাআলার মহান প্রতিনিধি। আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার ও

হুযূর (দঃ) আল্লাহ তাআলার মহান প্রতিনিধি। আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার ও নেয়ামতসমূহ হুযূরের হাতে ও ইচ্ছাধীনে রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছে প্রদান করেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহর সমস্ত ধনভাণ্ডার হুযূর (দঃ) এর কব্জায় ও কর্তৃত্বাধীন।

(৫) শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর রচিত আশয়াতুল লুমআতের ১ম খণ্ড ৪২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেনঃ

کہ قدرت وسلطنت دے صلی اللّٰہ علیہ وسلم زیادہ برآں بود – ملک وملکوت جن وانس تمامہ عوام بہ تقدیر تصرف الہی غز وجل در محیطہ قدرت وتصرف دے بود

অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব এর থেকেও অনেক ব্যাপক। জ্বীন ইনসান এবং সমগ্র জগত আল্লাহর অনুগ্রহে হুযূর আলাইহিস সালামের কব্জায় ও ক্ষমতাধীন।

এতে বুঝা গেল, সমস্ত জগত তথা ফিরিশতার জগত, রূহের জগত, শরীরের জগত, অস্তিত্বের জগত, মোট কথা সমস্ত সৃষ্টিকূলের উপর হুযূরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত।

خالق کل نے آپ کو مالک کل نبادیا

دونوں جہاں ہیں اپ کے قبضہ اختیار میں

অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকূলের সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিকূলের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব উভয় জাহান আপনার নিয়ন্ত্রাধীন।

(৬) আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল (রহঃ) শাওয়াহেদুল হক গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় বলেন-

اَمَّا كَوْنُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِىْ وَيَمْنَعُ وَيَقْضِىْ حَوَائِجَ السَّائِلِيْنَ وَيُفَرِّجُ كُرُبَاتِ الْكَرُوْبِيْنَ وَاَنَّهٗ يَشْفَعُ وَيَدْخِلُ الْجَنَّةَ مَنْ يَّشَاءُ

www.AmarIslam.com

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

آنحضرت متولی امور مملکت الهیه وگما شته درگاه الهی بود که تمام امور واحکام کون ومکان بوے مفوض بود کدام دائره مملکت واسع تراز دائره مملکك وسلطنت دے بود – صلی الله علیه وسلم

অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাজ্যের ব্যবস্থাপক এবং আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসক। দুনিয়ার সব কাজকর্ম ও আইন কানুন তাঁর হাতে ন্যস্ত। এর থেকে বড় রাজত্ব আর কি হতে পারে?

এতে বুঝা গেল হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব অন্যান্য সকল রাজত্ব যথা হযরত সোলাইমান, সেকান্দর, যুল করনাইন প্রমুখের রাজত্ব থেকে অনেক বড়।

(১২) ইমাম বুসীরী (কুঃ সিঃ) কসীদা বোর্দা শরীফে ইরশাদ করেনঃ

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا – وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ ইয়া রাসুল্লাল্লাহ, দুনিয়া আখেরাত আপনার বদান্যতার ফল। লওহ ও কলমের জ্ঞান আপনার জ্ঞান ভাণ্ডারের একটি নগন্য অংশ মাত্র।

(১৩) ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) কসীদায়ে নোমানে বলেনঃ

اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ

لِاَبِىْ حُنَيْفَةَ فِى الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ ইয়া রাসূলল্লাহ, আমি আপনার সাহায্যের প্রত্যাশী, সৃষ্টি জগতে আপনি ছাড়া আবু হানিফার আর কেউ নেই।

এ কসীদায় ইমাম আযম (কুঃ সিঃ) হুযূর আলাইহিস সালামের কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং তাঁর অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। মালিকের কাছেই প্রার্থনা করা হয়। অতএব বুঝা গেল যে, আমাদের ইমাম সাহেবও হুযূর আলাইহিস সালামকে সব কিছুর মালিক মনে করেন।

(১৪) দলায়েলুল খায়রাতে বর্ণিত দরূদ সমূহ পরীক্ষিত এবং সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে সাদরে গৃহীত। উলামা ও আউলীয়ায়ে কিরাম এগুলো নিয়মিত

পাঠ করেন। সেই কিতাবে বৃহস্পতিবার পড়ার জন্য নির্ধারিত দরূদ শরীফটি নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ حَآءِ الرَّحْمَتِهٖ وَمِيْمِ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ لِسَيِّدِ الْكَامِلِ الخ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যার নামের মধ্যে ح (হা) বর্ণটি রহমতের, م (মিম) বর্ণটি মালিকানার এবং د (দাল) বর্ণটি স্থায়ীত্বের প্রতীক।

অতএব 'মুহাম্মদ' শব্দের বর্ণগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হুযূর আলাইহিস সালাম উভয় জাহানের চিরস্থায়ী মালিক ও রহমত বর্ষণকারী। কেননা মুহাম্মদ শব্দের মধ্যে একটি ح (হা) একটি د (দাল) ও দুটি م(মিম) রয়েছে। মিমদ্বয় চিরস্থায়ী বাদশাহী এবং হা দ্বারা রহমতপূর্ণ বাদশাহী বুঝানো হয়েছে।

(১৫) মসনবী শরীফে বর্ণিত আছে-

صورتش برخاك وجاں در لامکان

لامکان بر تر زدہم سالکان

بل مکان ولامکان درحکم او

ہم چو در حکم بہشتی چار سو

ہر دمے او دریکے معراج خاص

بر سر فرقش نہد حق تاج خاص

অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শরীর মুবারকতো পৃথিবীতে রইলো কিন্তু তাঁর পবিত্র আত্মা লা মকামে অধিষ্ঠিত, যেটা আউলীয়ায়ে কিরামের চিন্তাধারা ও কল্পনা বহির্ভূত। মকান ও লা-মকান সব জায়গায় তাঁর কর্তৃত্ব বিরাজমান। তিনি সদা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকেন এবং আল্লাহর বিশেষ রহমতের অধিকারী।

এতে বুঝা গেল, মকান ও লা-মকান হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সাল্লাম) এর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। কেননা হুযূর উভয় জাহানের বাদশাহ এবং সব সময় আল্লাহর সাক্ষাত লাভ ও উর্ধজগৎ পরিভ্রমণ করেন, কোন সময় স্বপ্নে, কোন সময় নামাযে। এভাবে তিনি জান্নাত, দোযখ ইত্যাদিও অবলোকন করেন। এ ধরনের আরও অনেক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু এতটুকু যথেষ্ট মনে করি। বুজুর্গানে দ্বীন এমনকি সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর ইবাদতে হুযূরকেও সন্তুষ্ট করার নিয়ত করতেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে যে হযরত ছিদ্দিকে আকবর নামাযরত অবস্থায় হুযূর আলাইহিস সালামের আগমনে ইমামতির জায়নামায থেকে পিছনে সরে আসেন এবং হুযূর ইমামতি করেন। দেখুন ইবাদততো আল্লাহর করা হচ্ছিল। কিন্তু সেই ইবাদতরত অবস্থায় হুযূর আলাইহিস সালামের তাজীম করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ইবাদতে হুযূরকে সন্তুষ্ট করা শিরক নয় বরং ইবাদতের মূল।

তফসীরে খাযেন ও রুহুল বয়ানে ষষ্ঠ পারার আয়াত وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا এর প্রেক্ষাপটে এ হাদীছটি বর্ণনা করেন- একদিন হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আশয়ারী (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, আজ রাত আমি তোমার কুরআন তেলাওয়াত শুনেছি। আল্লাহ তাআলা তোমাকে দাউদী কণ্ঠস্বর দান করেছেন। এ কথা শুনে হযরত আবু মূসা আশয়ারী আরয করলেন, খোদার কসম, আমি যদি টের পেতাম যে আমার কুরআন তেলাওয়াত সাহেবে কুরআন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুনছেন তাহলে আমি আরও সুন্দর করে তেলাওয়াত করতাম। দেখুন তেলাওয়াতে কুরআন হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু একজন সাহাবী সেই অবস্থায়ও হুযূরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছে পোষণ করেন।

অনুরূপ তফসীরে রুহুল বয়ানে ১১ পারা, সূরা ইউনুচের আয়াত اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, হযরত রাবেয়া হুদবিয়া (রাঃ) প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন এবং বলতেন আমি এর ছওয়াব চাই না। আমার কাম্য হচ্ছে হুযূর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোক এবং কেয়ামতের মাঠে নবীগণকে সম্বোধন করে যেন বলেন এটা আমার উম্মতের একজন মহিলার আমল।

সুবহানাল্লাহ! রসূল প্রেমিকগণের মনোভাব অকৃত্রিম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান-

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

(যে নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরতের নিয়তে বের হলো ওর প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায় হয়ে গেল) হিজরত করা (আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করা) ইবাদত। কিন্তু হিজরতে আল্লাহ ও রসূল উভয়কে সন্তুষ্ট করার নিয়ত জরুরী। কুরআন করীম ফরমান اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ (আল্লাহ ও রসূল একান্ত হকদার যে ওনাদেরকে যেন সন্তুষ্ট করা হয়।) বুঝা গেল যে ঈমান ও আমলে আল্লাহ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত থাকলে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। সারকথা হলো নেক আমলসমূহে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর মাহবুব আলাইহিস সালামকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত করা শিরক নয়, হারামও নয়। এ জন্য নামাযে হুযূরকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলে সালাম করা ওয়াজিব। কলেমা, আযান ইত্যাদিতে হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র নাম অন্তুর্ভূক্ত করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হুযুর আলাইহিস সালামের রাজত্ব সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের উক্তি সমূহ

আমি দেওবন্দী ও ওহাবীদের মান্যবর কয়েকজন নেতার উক্তি উপস্থাপন করছি। খোদার কি শান! গোলেমালে তারাও হুযূরের রাজত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

(১) সিরাতুল মুস্তাকীম (উর্দু অনুবাদ) গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় ওহাবী ও দেওবন্দী মাযহাবের প্রবক্তা মওলভী ইসমাইল দেহলভী বলেন-

اسی طرح ان مراتب عالیه اور مناسب رتیه کے صاحبان عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے ماذون مطلق اور مجاز ہوتے ہیں

অর্থাৎ অনুরূপ ওসব উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণ দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখেন।)

এটাই যথেষ্ট। উনি নিজেই ফয়সালা করে দিলেন যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ উভয় জাহানে সব রকমের রাজত্ব করার ইখতিয়ার আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করে থাকেন।

(২) এ মওলভী ইসমাইল সাহেব একই জায়গায় আরও বলেন

مثلا ان کو جائز ہے کہ کہیں عرش سے فرش تك ہمارے سلطنت ہے

অর্থাৎ তাঁদের জন্য এটা বলা জায়েয আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত আমাদের রাজত্ব বিরাজমান। অতএব মওলভী ইসমাঈলের ফত্ওয়া অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে, আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত আমাদের আকা মওলা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রাজত্ব বিদ্যমান।

(৩) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলভী কাসেম সাহেব বলেন-

مدد کرائے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

অর্থাৎ হে দয়ালু আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে সাহায্য করুণ। অসহায় কাসেমের আপনি বিনা অন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

যার কাছে কিছু থাকে তার কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়। অতএব ওনার মতে হুযুর আলাইহিস সালাম মালিক ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

(৪) দেওবন্দীদের শেখুল হিন্দ মওলভী মাহমুদ হাসান সাহেব 'আদিল্লায়ে কামেলা' গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় বলেন-

آپ اصل میں مالك عالم ہیں جمادات ہوں یا حیرانات بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم - القصه آپ ہی اصل مالك ہیں اور یہی وجه ہے کہ عدل ومہرآپ کے ذمه واجب نه تھا

অর্থাৎ মূলতঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জড় পদার্থ, পশু পাখি, মানবজাতি ও বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকূলের মালিক। মোট কথা তিনিই আসল মালিক। একারণে তাঁর উপর মোহর,সমতা রক্ষা ওয়াজিব ছিল না।

আলহামদুলিল্লাহ! মওলভী সাহেব হুযূরকে মালিক স্বীকার করলেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে জগতের মালিক বললেন। সুতরাং এতে প্রমাণিত হলো যে আরশ, ফরশ লওহ কলম সব কিছু আমাদের প্রিয় নবীর মালিকানাধীন।

(৫) 'সিরাতুন মুস্তাকীম' গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় মওলভী ইসমাইল সাহেব বলেন-

اور حضرت مرتضی کے لئے شیخین پر ایگ گونه فضیلت ثابت ہے اور وه فضلیت آپ کے فرماں برداروں کا زیاده ہونا- مقامات ولایت بلکه قطبیت وغوثیت اور ابدالیت اور ان ہی باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے

کر دنیا ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہوتا ہے اور بادشا ہوہ کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو دخل ہے جو عالم ملکوت کے سیرکرنے والوں پر مخفی نہیں–

অর্থাৎ হযরত আলী মরতুজা (রাঃ) এর ক্ষেত্রে শেখাইন (হযরত ছিদ্দিকে আকবর ও হযরত ওমর রাঃ) অপেক্ষা একগুণ বেশী ফযীলত প্রমাণিত এবং সেই ফযীলত হচ্ছে তাঁর অনুসারী অধিক হওয়া, বেলায়েতের স্তর সমূহ যথা কুতুব, গাউছ, আবদাল ইত্যাদির সৃষ্টি এবং তাঁর যুগ থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তাঁদের খেদমত সমূহ তাঁরই ফয়ূজাতের মাধ্যমে হয়ে থাকবে। এবং বাদশাগণের বাদশাহীতে, শাসকদের শাসনে তাঁর হাত রয়েছে। ফিরিশতা জগতে পরিভ্রমণকারীদের এটা অজানা নয়।

এতে বুঝা গেল জাহেরী ও বাতেনী জগতে হযরত আলী (রাদি আল্লাহ আনহু) এর কর্তৃত্ব রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তিনি মৃত্যুর পরও দুনিয়ার মালিক। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা রাজত্ব ও গাউছিয়াত হযরত আলীর দরবার থেকেই লাভ করেন। এ ইসমাইল দেহলভী উপরোক্ত ইবারতেতো এ রকম বললেন কিন্তু তকবিয়াতুল ঈমানে তিনি বলেন 'যার নাম মুহাম্মদ বা আলী, সে কোন কিছুর মালিক, মুখতার নয়।' সম্ভবতঃ গুমরাহ হবার আগে প্রথমোক্ত উক্তিটা করেছিলেন এবং তকবিয়াতুল ঈমানের উক্তিটা পরে করেছেন।

(৭) দেওবন্দী আলেমগণের পীর মুর্শেদ' হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব বলেন-

جہاز امت کا حق نے کردیا ہے آپ کے ہاتھوں

تم اب چاہوڈ باؤ یاترا ؤیارسول اللّٰہ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীর জাহাজ আপনার হাতে সোপর্দ করেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন আপনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন।

এতে বুঝা গেল মুসলমানগণের সুখ-দুঃখ হুযূর আলাইহিস সালামের হাতে এবং তিনি লাভ ক্ষতির মালিক। দেওবন্দী ওহাবীদের আরও অনেক উক্তি পেশ করা যায়। তবে নমুনা হিসেবে উপরোক্ত উক্তিগুলো পেশ করা হলো।

www.AmarIslam.com

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্বের ব্যাপারে যুক্তি ভিত্তিক দলীল সমূহ

(১) দুনিয়াবী কাজকর্ম হচ্ছে পরকালের নমুনা বিশেষ। এর বিস্তারিত বিবরণ জাআল হকে দেয়া হয়েছে। পার্থিব বাদশাহ স্বীয় নিয়োজিত প্রশাসকগণকে শাসনকার্য পরিচালনায় যথেষ্ট ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে থাকেন। যার ফলে ওসব প্রশাসকগণ বলে থাকেন যে আমরা ইচ্ছে করলে এটা করতে পারি। আবার পদমর্যাদা অনুসারে ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন থানার ও সি মামুলী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। পুলিশ সুপারেন্টডেন্ট ওর থেকে অধিক ক্ষমতাবান হয়ে থাকেন। ডেপুটি কমিশনার আরও অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। গভর্ণরের ক্ষমতা আরও বেশী, রাজ্যপালের ক্ষমতা সমগ্র দেশব্যাপি পরিব্যপ্ত। প্রধান মন্ত্রী রাজত্বের ভাল মন্দ সব কিছু দেখার ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকার পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ সব অধিকার ও ক্ষমতা প্রদানের ফলে বাদশাহের রাজত্বে কোন তারতম্য সৃষ্টি হয় না এবং কোন কিছু তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায় না। বরং বাদশাহ সব কিছুর মূল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বলবৎ থাকেন। অন্যরা হচ্ছে তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ক্ষমতাবান। অনুরূপ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাজত্বে ফিরিশতা ও বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছেন। সেই ক্ষমতাবলে তাঁরা বলে থাকেন আমরা এ কাজ করতে পারি।

কুরআন পাকে বর্ণিত আছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, আমি অন্ধকে দৃষ্টি, মৃতকে জীবিত এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে পারি। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হযরত মরিয়মকে বলেছিলেন আমি তোমাকে পুত্র সন্তান প্রদান করতে এসেছি। কুরআন করীমে আরও বর্ণিত আছে, আমার মাহবুব আলাইহিস সালাম মুসলমানদেরকে পাক পবিত্র করেন।

ওদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, গরীবদেরকে সম্পদশালী করেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় ও জাআল হকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কসীদায়ে গাউছিয়ায় হুযূর গাউছে পাক বলেন-

بِلَادُ اللّٰهِ مُلْكِىْ تَحْتَ حُكْمِىْ – وَوَقْتِىْ قَبْلَ قَبْلِىْ قَدْ صَفَالِىْ

আল্লাহর সমস্ত শহর আমার মালিকানাধীন ও আমার কর্তৃত্বাধীন। তিনি আরও বলেনঃ

وَمَامِنْهَا شُهُوْرًا اَوْ دُهُوْرًا – تَمُرُّ وَاتَنْقَضِىْ اِلَّا اَتَالِىْ

অর্থাৎ কোন মাস বা সময় আমার বিনা অনুমতিতে পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারে না। তিনি আরও বলেন-

وَكُلُّ وَلِىٍّ لَهُ قَدَمٌ وَاِنِّىْ – عَلٰى قَدَمِ النَّبِىِّ بَدْرِ الْكَمَالِىْ

অর্থাৎ প্রত্যেক ওলীই কোন না কোন নবীর পায়ের উপর হয়ে থাকেন। আমি হুযূর (দঃ) এর পা মুবারকের উপর আছি। অর্থাৎ আমার মস্তক হুযূরের পবিত্র পায়ের উপর আছে। এর বরকতে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এ মর্তবা ও সম্মান দিয়েছেন।

হুযূর আলাইহিস সালামের অধীনস্থদের যখন এ রকম ক্ষমতা রয়েছে, হুযূরের রাজত্ব সম্পর্কে কি আর বলার আছে? উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোন প্রকারের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। বরং তিনি আসল মালিক হিসেবে ঠিকই আছেন। অন্যরা হচ্ছেন তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ক্ষমতাবান এবং হুযূর আলাইহিস সালামকে যেহেতু সর্বাধিক ক্ষমতা প্রধান করা হয়েছে এবং তিনি প্রধান মন্ত্রীতূল্য, সেহেতু তিনি জাহানের মালিক ও মুখতার।

(২) সবাই জানেন যে মৃত্যুর সময় হযরত আজরাইল আলাইহিস সালামকে দেখে ঈমান আনলে সেই ঈমান কবুল হয় না কিন্তু জেন্দেগীতে যে কোন সময় ঈমান আনলে কিংবা গুনাহসমূহ থেকে তওবা করলে তা কবুল হয়। অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারীর জন্য মৃত্যুর সময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু মৃত্যুর আগে এ দরজা সব সময়ের জন্য খোলা থাকে। তবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে তিনি ইচ্ছে

করলে কারো জন্য জিন্দেগীতে তওবার দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন। অর্থাৎ তওবা করলেও কবুল হবে না এবং ইচ্ছে করলে কারো জন্য মৃত্যুর পরও তওবার দরজা খুলে দিতে পারেন এবং ওকে জীবিত করে মুসলমান করতে পারেন।

দেখুন, হুযূর (দঃ) তাঁর পিতামাতাকে তাঁদের ইন্তেকালের পর জীবিত করে ইসলামে দীক্ষিত করেন, যার প্রমাণ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। হযরত জালাল উদ্দীন সয়ূতী ও আল্লামা শামী (রহঃ) এ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানগর্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

সায়ালাবা ইবনে হাতেব একবার যাকাত দিতে অস্বীকার করায় হুযূরের মনোক্ষুণ্ন হয়। পরে সে অনুসোচনা করে যাকাত নিয়ে হুযূরের দরবারে হাজির হলে তা অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর সেই যাকাত হযরত ছিদ্দিকে আকবরের খেলাফতকালে হাজির করা হয় কিন্তু সেখানেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। হযরত ওমর ফারুকের যুগে, অতঃপর হযরত ওসমানের খেলাফত কালেও সে যাকাত নিয়ে হাজির হয় কিন্তু কেউ গ্রহণ করেন নি এবং এ জবাব দিয়ে বিদায় করেন যে যার যাকাত হযূর আলাইহিস সালাম অগ্রাহ্য করেছেন তার যাকাত গ্রহণ করার দুঃসাহস আমাদের নেই। এ ঘটনা প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করে বলেছিলে যে তাঁর অনুগ্রহ আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সদকা দিব এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।)

লক্ষ্য করুন সায়ালাবার জন্য শরীয়ত মতে তওবার দরজা বন্ধ ছিল না তওবা কবুল হওয়াটাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে ওর তওবার দরজা বন্ধ করে দিলেন তখন সেটা বন্ধই রইলো। এটাই হচ্ছে হুযূর আলাইহিস সালামের ইখতিয়ার বা অধিকার।

(৩) এটা স্বাভাবিক যে প্রেমিক প্রিয়জনের জন্য সব কিছু উজাড় করে

www.AmarIslam.com

দেয়। কেননা প্রেমিক ও স্বীয় প্রিয়জনের মধ্যে আমার তোমার বলতে কিছু থাকে না। হুযূর আলাইহিস সালাম আল্লাহর এমন প্রিয়জন যে যিনি হুযূরের গোলামী স্বীকার করেন, তিনিও আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে যান। فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করবে। এতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।) অতএব আল্লাহর প্রত্যেক কিছু তাঁর মাহবুবের বললে অত্যুক্তি হয় না।

(৪) হুযূর আলাইহিস সালামের উপর যাকাত ফরজ নয়। (শামীর যাকাত অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এর কারণ এটাও হতে পারে যে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম নর-নারী হুযূরের গোলাম-বাঁদী বিশেষ এবং স্বীয় গোলাম-বাঁদীকে যাকাত দেয়া যায় না। তাই হুযূর কাউকে যাকাত দিতে পারেন না। কেননা হুযূর থেকে যাকাত নেয়ার কেউ নেই। যাকাত গ্রহীতা না থাকায় তাঁর উপর যাকাত ফরজ করা হয়নি।

(৫) নবীগণ হচ্ছেন আল্লাহর খলীফা। যেমন إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টিকারী) খলিফা বা প্রতিনিধি তিনিই হয়ে থাকেন যিনি মূলতঃ মালিকের প্রতিনিধি হয়ে মালিকের সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে হুকুম আহকাম প্রেরণ করেন এবং তাঁরা আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে সৃষ্টিকূলের উপর রাজত্ব করেন এবং প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব কালে মালিক বলেই গণ্য হয়।

(৬) আরশের নীচে, জান্নাতের তোবা বৃক্ষের পাতা সমূহে, হুরদের ললাটে এবং গেলমানদের বুকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লিখা আছে। এটা সচরাচর নিয়ম যে জিনিসের উপর প্রস্তুতকারক ও মালিকের নাম লিখা হয়। অতএব বুঝা গেল যে জান্নাত ও আরশের সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ এবং মালিক হলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ। যার জিনিস তাঁর নামই লিখা হয়েছে। এতে কারো আপত্তি করার কিছু নেই।

দুনিয়ার অনেক কিছুতেও প্রাকৃতিকভাবে হুযূর আলাইহিস সালামের নাম মুবারক লিখিত আছে। আমার কাছে একটি পাথর আছে যেটা কাশ্মীর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এলাকার একটি নদীতে পাওয়া গেছে। সেটাতে সুস্পষ্টভাবে محمد লিখা আছে। পাথরটির উপরিভাগ প্রাকৃতিকভাবে সবুজ এবং মুহাম্মদ শব্দটি ফিরোজী রং এ লিখা।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ 'রায়সীনা' প্রাসাদ নির্মাণ করার সময় একটি মর্মর পাথর করাত দিয়ে চিরা হলে এর ভিতরে কুদরতীভাবে محمد লিখিত পাওয়া গিয়েছিল। সেটার ফটো কপিও আমার কাছে আছে। যে কেউ সেই পাথর ও ফটোকপি আমার কাছ থেকে দেখে যেতে পারেন। অনেক লোক আমার কাছে এসে সেই পাথর ও ফটো দেখেন। আমার কথা হলো যদি হুযূর মালিক না হন, তাহলে এসব জিনিসের উপর কুদরতী হস্তে হুযূরের নাম কেন লিখা হলো? কয়েক বছর আগে জবলপুরের সাধারণ বাসিন্দারা এবং গুজরাতের অনেকে আসমানের নীচে উজ্জ্বল বর্ণে محمد লিখা দেখেছিলেন। গুজরাতের প্রত্যক্ষদর্শী মাস্টার মোহাম্মদ আরিফ সাহেব এখনও জীবিত আছেন। জবলপুরের কালেক্টর সাহেবও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। জনাব খাজা হাসান নিজামী তাঁর 'মুনাদী' নামক পত্রিকায় এ অপূর্ব ঘটনাটি প্রকাশ করেন। এ ঘটনাটা নিয়ে তিনি একটি আলাদা বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেন। তিনি ঘটনাটি এভাবে লিপিবদ্ধ করেন- এক রাত্রে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোকছটা পরিলক্ষিত হয়। লোকেরা উপর দিকে তাকালে দেখতে পায় নূরানী অক্ষরে محمد এবং সেই অক্ষরগুলো হতে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এ দৃশ্য প্রায় এক মিনিট স্থায়ী ছিল। ১৯৬২ সনে মন্টোগামারী এলাকায় একটি ছাগল ছানার পিঠে محمد লিখা ছিল। সুবহানাল্লাহ! দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে তাঁর রাজত্ব দেখার কিবা আর বাকী আছে।

(৭) মেরাজের রাত্রে আল্লাহ তায়ালা হুযূর আলাইহিস সালামকে উভয় জাহান পরিভ্রমণ করায়েছেন, লা মাকানের অবস্থানকারী বানিয়েছেন। কারণ বাদশাহ কখনো কখনো স্বীয় রাজ্য পরিদর্শনে বের হয়ে থাকেন। এটাও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্য স্বীয় সাম্রাজ্য পরিদর্শনের মত ছিল।

(৮) আজকাল দুনিয়াবী রাজা বাদশাহদেরকে লোকেরা ভাল মন্দ বলে থাকে। সংবাদপত্র সমূহে তাদের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে মুখে বা অন্তরে কারো কিছু বলার অবকাশ নেই। যে কেউ বেআদবী করলে সাজা পেয়ে যায়। এর ভূড়ি ভূড়ি প্রমাণ রয়েছে। তাঁর এ প্রভাব বা শাসন কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(৯) দুনিয়াবী বাদশাহ স্বীয় কর্মচারীদের বেতন দিয়ে থাকেন। আমাদের প্রিয় নবী (আলাইহিস সালাম) এর দরবার থেকেও আজও লাখো লোক বেতন পেয়ে থাকেন। বলতে পারবেন, যে সব মাওলানা পীর মাশায়েখ দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্ন জীবন যাপন করেন, তাঁরা কি কাজ করেন? তাঁরা লাকড়ী, লোহা বা কাপড় তৈরীর কাজ করেন না, কোন দিন মজুরির কাজও করেন না, হাকিমী বা ডাক্তারীও করেন না। তাহলে তাঁরা কি করেন, যার জন্য তাঁরা এত সম্মান সুখ-শান্তির অধিকারীও মুসলমানগণ তাঁদের খেদমত করে ধন্য হন। আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, কালিয়ার শরীফ ইত্যাদি জায়গায় সদা জাঁক জমক বিরাজ করছে। এর একমাত্র কারণ তাঁরা সেই শাহান শাহে মদীনা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খাদেম ও চাকর। এ কারণে মুসলমানগণ তাঁদের খেদমত করেন। তাঁরা হলেন শাহান শাহে মদীনার ধনাগারের প্রবেশ দ্বার। তাঁর নামের উসীলায় পানাহার ও সুখ-শান্তি ভোগ করেন। আল্লাহ তাআলা সেই মহান দরবারকে যেন চির আবাদ রাখেন, আমরা ভিখারীদের জন্য এ প্রবেশদ্বার ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے

غریبوں فقیروں کو ٹھیرانے والے

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমরা ভিখারীদেরকে যেন তাঁর মাহবুবের আস্তানায় স্থান দেন।

ওহে দেওবন্দী-ওহাবী মওলভীগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে নিমক হালালী হও। যাঁর নামের বদৌলতে খাচ্ছেন, উপার্জন করেছেন, তাঁর দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করবেন না। বরং সেই নামের গুণকীর্তন করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে

www.AmarIslam.com

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হেদায়েত দান করুন এবং আমাদেরকে অটল রাখুন। জাতীয় সংসদের সদস্য থেকে শুরু করে মাদ্রাসা কমিটির সদস্য সবাই সেই দরবারের ভিখারী। সংসদের সদস্যরা ইসলামের নামে ভোট প্রার্থনা করে এবং মাদ্রাসার সদস্যরা ইসলামের নামে মুসলমানদের সদকা, খায়রাত সংগ্রহ করে থাকে। সংসদ সদস্যদের উচিৎ সংসদে গিয়ে যেন ইসলামের কথা ভুলে না যায় এবং মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও উচিৎ, তাঁরা যেন সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা প্রসারে আত্ম নিয়োগ করেন। আল্লাহ তাআলা আমরা সবাইকে যেন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার তওফীক দান করেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ নসীব করেন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

১৯৪৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূত পুর্ব বিজয় অর্জন করেছিল। মুসলমানগণ মিঃ জিন্নাহ বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য মুসলিম লীগকে ভোট দেন নি। বরং শাহান শাহে দো আলাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নামের বদৌলতেই বিজয় অর্জন করেছিল। মুসলমানগণ মুসলিম শব্দকেই ভোট দিয়ে ছিলেন। উভয় জাহানে সেই শাহান শাহে দো জাহানের বিজয় ডংকা বাজ্‌ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাহান শাহে দো-আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রাজত্ব সম্পর্কে আপত্তি সমূহ ও এ সবের জবাব

এ বিষয়ে যতসব আপত্তি করা হয়েছে, ও সবের প্রধান কারণ হলো আপত্তিকারীরা বিষয়টি মোটেই বুঝেনি। তারা আল্লাহর মালিকানা ও হুযুরের মালিকানার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে না পেরে এ বলে হৈ চৈ শুরু করলো যে যদি হুযুর উভয় জগতের বাদশাহ হন, তাহলে আল্লাহর জন্য আর কি রইলো? এক বিশ্বের দুই মালিক কি করে হতে পারে বা হুযূর কি আল্লাহ থেকে বেপরওয়া হয়ে গেলেন? অথচ প্রত্যেক বান্দা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এ বিষয়টি আমি প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়েও আলোচনা করবো যেন তাদের বুঝে আসে। এ পর্যন্ত বিরোধিতাকারীরা যে সব আপত্তি করেছে, সে সবের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলো। আগামীতে আরো আপত্তি করলে সে সবের জবাব পরবর্তী সংস্করণে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আপত্তি নং ১ঃ কালামে পাকে বর্ণিত আছে

قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ

(হে মাহবুব, আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে বলছিনা যে আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার রয়েছে।) এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে হুযূরের কাছে কিছু নেই। তাহলে মালিক হয় কি করে?

জবাবঃ এ আপত্তির কয়েকটি জবাব আছে, প্রথমতঃ এ আয়াতে ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়াটা অস্বীকার করা হয়নি বরং দাবী করাটাই অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লোকদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার সমূহ রয়েছে। কেননা দাবী সেই করে থাকে যার মধ্যে আত্ম নিয়ন্ত্রনের

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যেভাবে এত ব্যাপক রাজত্ব দিয়েছেন সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। যে সব ধনাগারে অধিক মূল্যবান ধন দৌলত রাখা হয়, সেটার দরজায় অধিক মজবুত তালা লাগানো হয়।

ہر دہانش قفل ودر دل رازہا

لب خموش ودل پراز آوازہا

অর্থাৎ মুখ হচ্ছে অন্তরের দরজা। মানুষ যত উচ্চ স্তরের হয়, তাঁদের মুখও তত সংযত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে ধন-দৌলত সমূহ নিজের কাছে হওয়াটাই অস্বীকার করা হয়েছে, মালিক হওয়াটা অস্বীকার করা হয়নি। কারণ ধন-দৌলত তো ভাণ্ডার রক্ষকের কাছে গচ্ছিত থাকে। মালিকের কলম ও মুখের নির্দেশে বন্টন করা হয়। রাজা বাদশাহগণ নিজেদের কাছে টাকা পয়সা রাখেন না। তাঁদের নির্দেশে কোষাগার থেকে প্রদান করা হয়। এ আয়াতে মূলতঃ এটাই বলা হয়েছে যে আমি মালিক, ভাণ্ডার রক্ষক নই। আমার হ্যাঁ বা না বলার দ্বারা সব কিছু হয়ে থাকে। ইতোপূর্বে কি পাঠ করনি যে আমার ইঙ্গিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, আর এক ইঙ্গিতে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ হয়েছে।

তৃতীয়তঃ এ আয়াতে মুনাফিক ও কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মুনাফিক ও কাফিরগণ হচ্ছে চোর ডাকাত। চোর-ডাকাত থেকে ধনদৌলত গোপন রাখা হয়। তাই ওদের কাছে ব্যক্ত করা হয়নি কিন্তু এ ভেদের কথা নির্ভয়যোগ্য লোকদেরকে বলা হয়। তাই মুসলমানগণকে বলেছেন أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ(আমাকে দুনিয়ার ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি প্রদান করা হয়েছে।) এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ خَزَائِنُ اللّٰهِ বলতে ধনদৌলত তৈরীর কারখানাকে বুঝায় এবং خَزَائِنُ الْمَخْلُوقِ বলতে ধানাগার বুঝায়। যেমন টাকশালে টাকা তৈরী হয় এবং কোষাগারে টাকা রক্ষিত হয়। জণগণের মধ্যে কেউ টাকশাল তৈরী করতে পারে না। তবে যে কেউ কোষাগার তৈরী করতে পাবেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

অর্থাৎ আমার কাছে প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার রয়েছে। আমি সেগুলো যথাযতভাবে দান করি।

এ আয়াতের ভাবার্থ এ নয় যে সব জিনিস কোন এক জায়গায় মওজুদ আছে, ওখান থেকে বের হয়ে আসছে। বরং আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে ক্ষমতাবান এবং সৃষ্টি করতে আছি। সুতরাং আপত্তিকারীদের উত্থাপিত আয়াতে হুযূরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে আপনি এটা বলে দিন যে আমার কাছে خَزَائِنُ اللّٰهِ অর্থাৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। আমি সৃষ্টিকর্তা নই। (রূহুল বয়ান দ্রষ্টব্য) তবে خَزَائِنُ الْمَخْلُوقِ (সৃষ্টিবস্তুর ধনভাণ্ডার) সম্পর্কে বলছেন যে আমাকে ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি দেয়া হয়েছে।

আপত্তি নং ২ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (হে মাহবুব, আপনি বলে দিন, আমি তো নিজের জন্যও কল্যাণ অকল্যাণ করার অধিকারী নই। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন) এতে বুঝা গেল, হুযূর নিজের কল্যাণ-অকল্যান করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় তিনি অন্যের জন্য কি করতে পারবেন?

জবাবঃ আপত্তিকারী সম্ভবতঃ إِلَّا مَا شَاءَ বাক্যাংশটি দেখে নি। আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে আমি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন লাভ ক্ষতির মালিক নই। তবে তিনি ইচ্ছে করলে এবং প্রদান করলে আমি মালিক হতে পারি। এখানে সত্ত্বাগত মালিকানা অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রদত্ত মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে। এ কথাটিই আমরা বলে থাকি। আশ্চয্যের বিষয়, একজন নগন্য দারোগা আপনার ক্ষতি করতে পারে, আপনাকে বন্দী বা কারাগারে পাঠাতে পারে কিন্তু শাহান শাহে দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে না।

আপত্তি নং ৩ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান قُلْ لَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, যদি আমার কাছে সে আজাব দেয়ার ক্ষমতা থাকতো যেটার জন্য তোমরা তাড়া হুড়া করছ, তাহলে আমার ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হয়ে যেত।) এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, হুযুর আলাইহিস সালাম কারো প্রতি আজাব নাজিল করতে অক্ষম। এ জন্যই উক্ত আয়াতে তিনি স্বীয় অপারগতা প্রকাশ করেছেন। কাফিরেরাতো আজাব চাচ্ছে আর হুযূর অপারগতা প্রকাশ করছেন।

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ ফরমানঃ

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ

(হে মাহবুব! ওসব কাফিরদের মুখ ফিরানো (উপেক্ষা) আপনার কাছে যদি অসহ্যনীয় হয়, তাহলে ভূগর্ভে কোন সুড়ংগ বা আসমানে উঠার কোন সিড়ি খুঁজে বের করুন। অতঃপর তাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে আসুন) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে হুযূর কারো জন্য কিছু করতে পারেন না। আজাব নাজিল করার ক্ষমতাও রাখেন না। হুযূর আলাইহিস সালামের এটা বাসনা ছিল যে সব লোক ইসলাম গ্রহন করুক কিন্তু এ রকম হলো না বরং তাকে সেই বাসনা থেকে বিরত রাখা হলো। অনুরূপ আবু তালিবের ঈমানের ব্যাপারে হুযূর আলাইহিস সালাম আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ؕ

(আপনি যাকে ইচ্ছে তাকে হেদায়েত করতে পারেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হেদায়েত দিতে পারেন।) এতে বুঝা গেল কাউকে হেদায়েত করার ক্ষমতাও হুযূরের নেই। এটাই বিরোধিতাকারীদের প্রধান আপত্তি।

জবাবঃ এ আপত্তির মূল কথা হলো আমরা যে হুযূরের অধিকারের কথা বলি, বিরোধিতাকারীরা সেটাকে আল্লাহর মুকাবিলায় স্বয়ং সম্পূর্ণ অধিকার হিসেবে ধরে নিয়েছে। অথচ সেটা আমাদের দাবী নয়। উপরোক্ত আয়াতে সেই স্বয়ং সম্পূর্ণ অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ সব কিছু যদি স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে আমার কব্জায় থাকতো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য আজাব নিয়ে আসতাম। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর অভিপ্রায় নয় যে এ মুহূর্তে কাফিরদের উপর আজাব আসুক, এ জন্য এখন আজাব আসতেছে না। অথবা আল্লাহর ইচ্ছে নয় যে ওদের দাবী অনুযায়ী মোজেজা দেখানো বা আবু তালেবের ঈমান

www.AmarIslam.com

প্রকাশ করা। আমার দ্বারা এ কাজ হতে পারে না। যদি আমি ও সব কাজে আল্লাহর মুখাপেক্ষি না হতাম বরং স্বয়ং সম্পূর্ণ হতাম, তাহলে এ কাজ আমি নিজেই করে ফেলতাম। আজ আমি যে সব জিনিসের মালিক যেমন ভুমি, আসবাব পত্র ইত্যাদি, সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর মর্জি ব্যতীত কিছু করতে পারি না। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমানঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(তোমরা আল্লাহর মর্জি ব্যতীত কোন কিছু চাইতে পার না) এর দ্বারা এটা বলা যায় না যে আমরা কোন কিছুর মালিক নই। বরং এটা বলা যায় যে, প্রকৃত মালিকের মুকাবিলায় ক্ষমতা প্রাপ্ত মালিকের কোন গুরুত্ব নেই। অনুরূপ اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- হে মাহবুব, যাকে আমি হেদায়তদানে ইচ্ছুক নই আপনি ওকে হেদায়েত দান করতে পারেন না। অতঃপর ইরশাদ করেছেন: وَلٰكِنَّ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হেদায়েত দান করেন।) এ আয়াতের ভাবার্থও তাই, যা আমি একটু আগে আলোচনা করেছি অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে কেউ কিছু করতে পারে না তবে খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অন্যরাও হেদায়েত করতে পারেন। যেমন কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ (এ কুরআন সরল পথের প্রতি হেদায়ত দান করেন) অন্যত্র বর্ণিত আছে وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (হে মাহবুব, আপনি অবশ্যই সরল পথের প্রতি হেদায়ত করেন) এ আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে কুরআন ও হুযূর আলাইহিস সালাম হেদায়ত করতে পারেন কিন্তু আগের আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হেদায়ত করতে পারে না। এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। তবে খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কুরআনও হেদায়েত করতে পারেন এবং সাহেবে কুরআন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও। فَاِنِ اسْتَطَعْتَ আয়াতেও এ কথাটি বলা হয়েছে- হে নবী, এ কাজ আমার মর্জি ব্যতীত আপনি করতে পারেন না। এর অর্থ এ নয় যে নবীর কোন ক্ষমতা নেই। আমরা বলতে পারি যে বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে ফাঁসি দিতে পারেন না যদি সেই ব্যক্তির মৃত্যু না আসে বা আল্লাহর বিনা মর্জিতে কারো কল্যাণ বা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অকল্যাণ করতে পারেন না। এটা একেবারে সঠিক কথা। অথচ বাদশাহের ফাঁসি দেয়া, কল্যাণ অকল্যাণ করার ক্ষমতা রয়েছে। অন্যথায় বাদশাহ ও প্রজার মধ্যে কি আর পার্থক্য রইলো। এটাই এখানে বলা হয়েছে। তুলনা নয় শুধু বুঝার জন্য বলছি যে বাদশাহ আল্লাহর মুখাপেক্ষি এবং প্রজার হাজত পূর্ণকারী। অনুরূপ আল্লাহর মাহবুব আল্লাহর মুখাপেক্ষি এবং মখলুকের হাজত পূর্ণকারী। তিনি (দঃ) মওলার বান্দা এবং বান্দাদের মওলা।

বিঃ দ্রঃ কোন আপত্তি উত্থাপন করার সময় শালীনতা বজায় রাখা উচিত। হঠাৎ বেআদবীমূলক কোন শব্দ মুখ থেকে বের হলে পরিণতি খারাপ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন তাঁর প্রতিপালক এবং তিনি হচ্ছেন তার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে স্মরণ করেন, সম্মানিত করেন এবং তাঁরাও তাঁদের আকাংখা অনুসারে তাঁদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের মনোবাসনা প্রকাশ করেন। আমাদের মত নগন্য গোলামদের পক্ষে তাঁদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই।

از خدا خواهیم توفیق ادب
بے ادب محروم ماند از فضل رب

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে বাআদব হওয়ার তৌফিক কামনা করছি। কেননা বেআদব আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত।

আপত্তি নং ৪ঃ কুরআন করীম ইরশাদ ফরমানঃ

اَسْتَغْفِرْلَكُمْ اَوْ لَاتَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

(হে মাহবুব, আপনি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, এমন কি সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ ওদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, হুযূর মুনাফিকদের জন্য দুআ করলেও আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না। তাহলে মালিকানা ও বন্ধুত্বের যে ডংকা বাজানো হচ্ছে, সেটা কোথায় বজায় রইলো?

জবাবঃ এ আয়াতেতো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উচ্চ

মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত ওসব লোকদের প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে, যারা হুযূরের গোলামদের সাথে বিদ্রুপ করে হুযূরের মনে কষ্ট দিত। যেমন এর আগের আয়াতে বর্ণিত আছে।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ

(যারা সদকা প্রদানকারীকে দোষারোপ করে............) বুঝা গেল ওরা দরবারে মুস্তাফার অপরাধী। ওদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, হে মাহবুব, ওরা আপনাকে মনোকষ্ট দিয়েছে। তাই আমি ওদের এ অপরাধ কখনো ক্ষমা করবো না। এ বক্তব্য থেকে এ কথাটিও পরিস্কার হয়ে গেল যে বারগাহে নববীর অপরাধীদের কোথাও আপিল করার সুযোগ নেই। কোথাও ওদের আশ্রয় নেই। উপরোক্ত আয়াতে এটাই প্রকাশ করা হয়েছে ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ কেননা তারা আল্লাহ ও রসূলের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে।

একটি সূক্ষ্ম কথাঃ প্রিয়জনের প্রতি আকর্ষণটা সীমাহীন হয়ে থাকে। প্রিয় জনের প্রতি অসদাচরণকারীর অপরাধকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে না দেখাটাই হচ্ছে ভালবাসার বহিঃ প্রকাশ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁর রহমত সীমাহীন। যে যে রকম অপরাধ করুক, তিনি ক্ষমা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর মাহবুবের প্রতি সীমাহীন মহব্বতের কারণে ওসব অপরাধীদের কিছুতেই ক্ষমা করতে রাজি নয়, যারা তাঁর মাহবুবের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে, ওদেরকে ক্ষমা না করার মধ্যে হুযূরের শান মানই প্রকাশ পায়।

خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد
محمد جو پکڑیں نہیں چھوٹ سکتا

অর্থাৎ যে আল্লাহর নিকট ধরা পড়ে, হুযূর আলাইহিস সালামের সুপারিশে আল্লাহর কাছ থেকে মাফ পেয়ে যেতে পারে কিন্তু হুযূরের নিকট যে ধরা পড়ে ওর সুপারিশকারী কেউ নেই। এ জন্যই সুফীগণ বলে থাকেন।

باخدا دیوانه باش وبامحمد هو شیار

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে পাগল হয়ে আস্তে পারে। তবে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে যেন একটু হুঁস জ্ঞান ঠিক রেখে আসা হয়। এখানে উচ্চস্বরে কথা বললেও আমলসমূহ বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বুযুর্গানে কিরাম অনেক সময় জজবার মধ্যে اَنَا الْحَقُّ (আমিই খোদা) বলে ফেলেছেন কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত اَنَا مُحَمَّدٌ (আমিই মুহাম্মদ) বলেন নি।

اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں
سارے انہیں کا منہ تکتے ہیں
جن وملک ان کے سلامی
فخر ہے سب کو ان کی غلامی

অর্থাৎ বড় বড় মনীষীরা তাঁর দরবারে মাথানত করে তাঁর করুণার ভিখারী হয়ে তাঁর মুখপানে চেয়ে আছেন। জ্বিন-ফিরিশতা সবাই তাঁর অনুগত, তাঁরই গোলামীতে তারা গর্বিত।

আপত্তি নংঃ ৫ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ (হে মাহবুব, বিষয়টা আপনার হাতে নয়, আল্লাহ ওদেরকে তওবার তৌফিক দিন বা ওদেরকে আজাব দিন, ওরা জালিম।)

দেখুন, হুযূর আলাইহিস সালাম বীরে মাউনার কাফিরদের জন্য আজাব প্রার্থনা করেছিলেন। হুযূরকে সেই বদদুআ থেকে বারণ করা হয়েছিল। যদি তিনি মালিক হতেন এবং তাঁর প্রতিটি কথা যদি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হতো, তাহলে এ ধরনের আয়াত কেন নাজিল হলো?

জবাবঃ এ আয়াতে তো হুযূর আলাইহিস সালামের শান বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর রীতি হচ্ছে তাঁর কোন প্রিয় বান্দা যদি এমন কোন বিষয়ে দুআ করে, যেটা আল্লাহর অভিপ্রায়ের বিপরীত, তাহলে ওনাকে সেই দুআ থেকে বারণ করে বলেন- হে মাহবুব, এটা আমার ইচ্ছার বিপরীত, এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কোন কিছু হওয়া অসম্ভব আর আমি এটাও চাইনা যে

আপনার দুআ বিফল হোক। তাই আপনি এ ব্যাপারে কোন দুআ করবেন না। এতে নবীগণের মান শান প্রকাশ পায়। আজকাল আমরা এমন অনেক দুআ করতেছি যেগুলো বিফল হচ্ছে। কিন্তু নবীগণের দ্বারা এমন দুআ করানো হয় না, যেগুলো বিফল হয়। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন লুত আলাইহিস সালামের কাউমের জন্য দুআ করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁকে এ নির্দেশ দেয়া হয়-

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ

(হে ইব্রাহীম! এ দুআ থেকে বিরত থেকো। কেননা সেই কউমের উপর আজাব আসাটা অবধারিত।) এ রকম হুযূর আলাইহিস সালামকে সেই দুআ থেকে বারণ করা হয়েছে এবং এ বারণ করার দ্বারা হুযূরের শান মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

আপত্তি নং ৬ঃ কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান- হে মাহবুব, আপনি বলে দিন اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَايُوْحٰى اِلَىَّ (আমিতো সেটারই অনুসরণ করি, যেটা আমার প্রতি ওহী করা হয়) এতে বুঝা যায় যে হুযূর আলাইহিস সালাম নিজের থেকে কিছু বলতে পারতেন না। বরং কেবল ওহী মোতাবেক নির্দেশ দিতেন। তাই তিনি কিভাবে আহকামের মালিক হতে পারেন। বরং তিনিতো আমাদের মত অসহায় বান্দা (মাযাল্লাহ)

জবাবঃ আয়াতটি পুরাপুরি উল্লেখিত হয়নি, পুর্ণ আয়াতটি হচ্ছে-

قُلْ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَايُوْحٰى اِلَىَّ ۝

(হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, আমার এ অধিকার নেই যে কুরআনকে পরিবর্তন করি। আমি কেবল আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করি।)

এ আয়াতের শানে নজুল হচ্ছে, একবার আস বিন ওয়ায়েল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, আপনি যদি কুরআনকে পরিবর্তন করেন অথবা অন্য কুরআন আনয়ন করেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। তদুত্তরে এ আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে- হে মাহবুব, আপনি বলে

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দিন, এ সব কিছু আমি করতে পারবো না। আমিতো কেবল ওহীর অনুসরণ করে থাকি অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, তা পৌছায়ে দি। এতে আমি নিজের পক্ষ থেকে তারতম্য করতে পারি না, যে রকম ইহুদী আলেমরা করেছিল। এখানে অনুসরণের অর্থ হচ্ছে কুরআন যে রকম অবতীর্ণ হয়েছে, এর মধ্যে কোন তারতম্য না করে অবিকল প্রকাশ করা। مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِىْ এর মধ্যে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে যে কুরআন নিজের ইচ্ছে অনুসারে বদলানো যায় না। হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালার কাছে আরয করে বদলানো যায় এবং এ রকম অনেক হয়েছে। কুরআনী আয়াত যে হুযূরের মর্জি মুতাবেক নাযিল হয়েছে বা পরিবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ রহিত হয়েছে, এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

বায়তুল মুকাদ্দস মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল। কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালামের কাম্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবায়ে মুয়াজ্জমা কিবলা হওয়া। একদিন বার বার আসমানের দিকে মাথা মুবারক উঠায়ে থাকাচ্ছিলেন এবং কিবলা পরিবর্তনের হুকুমের প্রত্যাশা করছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুবের এ আচরণকে খুবই পছন্দ করলেন এবং নাযিল করলেন-

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

(হে মাহবুব, আমি আসমানের দিকে আপনার তাকানোটা লক্ষ্য করছি। এতএব এখন আপনাকে সেই কিবলার দিকে ফিরায়ে দিচ্ছি, যেটা আপনি কামনা করছেন।)

এতে বুঝা গেল হুযূরের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর কাম্য অনুসারে কিবলা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। তফসীরে রুহুল মায়ানীতে وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক কউম বরং প্রত্যেক জিনিসের আলাদা আলাদা কিবলা রয়েছে, সেদিকে সেটার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। যেমন ফিরিশতাদের কিবলা বায়তুল মামুর, দুআর কিবলা আসমান; রূহ সমূহের কিবলা সিদরাতুল মানতাহা, হুযূরের কিবলায়ে জিসিম কাবায়ে মুয়াজ্জমা এবং কিবলায়ে রূহ আল্লাহ তায়ালা। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কিবলা

হচ্ছে তার মাহবুব মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। সব সময় তাঁর প্রতি রয়েছে আল্লাহর কৃপা দৃষ্টি। মছনবী শরীফে বর্ণিত আছে-

قبلئه شاهاں بود تاج وگهر - قبلئه ارباب دنیا سیم وزر

قبلئه صورت برستاں آب وگل - قبلئه معنی شناساں جاں ودل

قبلئه عاشق وصال بے زوال - قبلئه عارف جمال ذو الجلال

অর্থাৎ রাজা বাদশাহের কিবলা রাজমুকুট ও হীরা মুক্তা, দুনিয়াদারের কিবলা ধনসম্পদ, মূর্তি পূজারীদের কিবলা পানি ও ফুল, গবেষকদের কিবলা মন-মানসিকতা, প্রেমিকের কিরলা স্থায়ী মিলন, আরিফের কিবলা আল্লাহর দীদার। মোট কথা, কিবলার পরিবর্তন হুযুর আলাইহিস সালামের খাতিরে হয়েছে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ (তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর বা না কর, যে কোন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা হিসেব নিবেন) এতে বুঝা গেল মনের খেয়াল সমূহেরও হিসেব নেয়া হবে। কিন্তু হুযুর আলাইহিস সালামের বাসনা ছিল যে আল্লাহ তায়ালা যেন মনের খেয়ালের হিসেব না নেয়, কারণ এটা সাধ্যের বাইরে। সুতরাং পুণরায় নাযিল করলেন; لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ তায়ালা কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দিবেন না) এতে বুঝা গেল, মনের খারাপ ধারণা সমূহ, যা আনায়াসে মনে এসে যায়, ক্ষমাকৃত।

হুযূর আকদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হজ্বের সময় দুআ করলেন যেন হাজীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আল্লাহ বাণী পাঠালেন যে বান্দার হক ব্যতীত সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। মুযদালাফায় পুণরায় দুআ করলেন হে আল্লাহ, বান্দার হকও হাজীদের থেকে মাফ করে দিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হলো সেটাও মাফ করে দেয়া হয়েছে। (মিশকাত শরীফে কিতাবুল হজ্ব দ্রষ্টব্য) এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর একটি জবাব হচ্ছে আয়াতে বলা হয়েছে اِنْ يَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ (আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি সেটার অনুসরণ করি।) হুযূর আলাইহিস সালাম যেটা বলেন, সেটাও ওহী বা প্রত্যাদেশ হিসেবে গণ্য। এ

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

জন্য হাদীছে মুতওয়াতের দ্বারা কুরআনী হুকুম রহিত করা জায়েয। অনেক ক্ষেত্রে অনেককে কুরআনী হুকুমের আওতামুক্ত করেছেন। এর কিছু বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। উত্থাপিত আয়াতের যদি এ অর্থ করা হয় যে আমি কেবল কুরআনের অনুসরণ করি, তাহলে হাদীছও অগ্রাহ্য হয়ে যাবে।

আপত্তি নং ৭ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বদর যুদ্ধে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। এতে হুযূরকে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হলো এবং আল্লাহ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। যদি হুযূর আহকামের মালিক হতেন, তাহলে তাঁর যেটা সেটা করার অধিকার থাকতো, ওনার কোন কাজের জন্য তিরস্কৃত হতেন না।

জবাবঃ এ ঘটনা থেকেতো হুযূরের মালিকানাই প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি যদি আমাদের মত অক্ষম বান্দা হতেন, তাহলে এ সাহস কি করে দেখালেন যে ওহী আসার অপেক্ষা না করে যুদ্ধবন্দীদের থেকে মুক্তি পণ নিয়ে নিলেন এবং ওদেরকে ছেড়েও দিলেন। আগে থেকে এটা নিয়ম ছিল যে হুযূরের মর্জি মোতাবেক আহকাম জারি করা হতো। সেই ধারণায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে তাই করেছিলেন।

হুযূর আলাইহিস সালাম যদি হুকুম আহকামের মালিক না হতেন, তাহলে এ রায় ভুল সাব্যস্ত হতো এবং যে টাকা মুক্তিপণ হিসেবে নেয়া হয়েছিল, সেটা হয়তো কাফিরদেরকে ফেরত দিতে হতো অথবা সমুদ্রে ফেলে দিতে হতো। কেননা অবৈধ টাকা কোন কাজে ব্যয় করা জায়েয নেই। তাছাড়া ভবিষ্যতের জন্য নিষেধ করা হতো যেন আগামীতে কোন মুক্তিপণ নেয়া না হয়। কিন্তু এ রকম কিছু হলো না বরং সেই টাকা মুসলমানদের জন্য হালাল রইলো। বলা হলো فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (হে মুসলমানগণ, যে গনীমত তোমরা গ্রহন করেছ সেটা ভোগ কর, সেটা হালাল ও পবিত্র)

মজার ব্যাপার হলো মুক্তিপণ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পরও হযরত আব্বাস ও হুযূরের কন্যা হযরত যয়নাবের স্বামী হযরত আবুল আস থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য এটা আইনে পরিণত হয়েছিল যে মুসলমানেরা ইচ্ছে করলে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে

www.AmarIslam.com

দিতে পারেন। যেমন ইরশাদ করা হয়েছে- فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً (বন্দীদেরকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিতে পার অথবা মুক্তিপণ নিয়ে নাও অর্থাৎ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পার) যদিওবা হানাফীদের মতে পরবর্তীতে এ আইন রহিত হয়ে গেছে কিন্তু তখনকার সময়ে সেটা আইনে পরিণত হয়েছিল। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয় যে বিরোধিতাকারীদের মতে মুক্তিপণ গ্রহন করায় তিরস্কার করা হলো। অথচ মুক্তিপণ ভোগ করাটা জায়েজ রাখা হলো এবং ভবিষ্যতের জন্য এ আইন বলবৎ করা হলো।

আল্লাহ তাআলা যদি এ মুক্তিপণ নেয়ার জন্য অসন্তুষ্ট হতেন, তাহলে এ মুক্তিপণ কেন নিতে দিলেন, আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে এর থেকে কেন বাঁধা দিলেন না?

আসল ব্যাপার হলো অধঃস্তন কর্মকর্তার হুকুম উর্ধতন কর্মকর্তা স্থগিত করতে পারেন, পরিবর্তনও করতে পারেন এবং এর জন্য তিরস্কারও করতে পারেন। কিন্তু এ সব কিছু ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরিপন্থী নয়। দেখুন, আমরা নিজেদের ঘরবাড়ী বিক্রি করি কিন্তু অনেক সময় সরকার সেই বিক্রয়ে বাঁধা প্রদান করে, কোন সময় সেই বিক্রিত ঘর ফিরায়ে দেয় এবং বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। রেজিষ্ট্রি ছাড়া বিক্রয় করা হলে তিরস্কার করা হয় এবং শাস্তিও দেয়া হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে সরকার প্রজাদের ঘর বাড়ী প্রয়োজনে হুকুম দখল করে নিজের কাজে লাগায়। এর অর্থ এ নয় যে আমরা আমাদের ঘরের মালিক নই। বরং আমাদের মালিকানা থেকে সরকারের মালিকানা ব্যাপক বিধায় এ আচরণ করার অধিকার রাখে। এখানে হুযূরের এ নির্দেশ আল্লাহর রেজিষ্ট্রি ছাড়া হয়েছিল। তাই এ রেজেষ্ট্রি না করার জন্য হুযূরের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হলো, হে মাহবুব! এত বড় কাজ আমার ফয়সালা ছাড়া না হওয়া উচিত ছিল। তবে হুযূরের ফয়সালা বলবৎ রাখা হলো। মোট কথা, এ আয়াতটি হুযূরের মালিকানার দলীল।

আপত্তি নং- ৮ঃ যখন কাফিরেরা হুযূর আলাইহিস সালামের কাছে দাবী করলো- স্বর্ণের পাহাড়, উন্নত ফলের বাগান এবং পানির নহর সৃষ্টি করে দেখান। এর উত্তরে বলা হলো هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا আমিতো মানুষ রসূল অর্থাৎ স্বীয় অপারগতা প্রকাশ করলেন। যদি হুযূর মালিক হতেন,

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাহলে এগুলো প্রকাশ করে দেখাতেন।

জবাবঃ কাফিরদের এ সমস্ত প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এ সব কাজ করে দেখাতে পারলে তারা নবী বলে মেনে নিবে অন্যথায় মানবে না। অর্থাৎ নাবুয়াতকে এসব কাজের উপর নির্ভরশীল মনে করলো। হুযূর তাঁর উত্তরে এ ভুল ধারণা খণ্ডন করলেন অর্থাৎ সোনার পাহাড়, ফলের বাগান ও নহর তৈরী করে দেখাতে পারলে নবী, না পারলে নবী নয় এ সব কাজের উপর নবুয়াত নির্ভরশীল নয় বরং নাবুয়াত হচ্ছে মানবিক গুণাবলীর একটি গুণ। হুযূর আলাইহিস সালাম নাবুয়াত দাবী করেছেন, খোদায়ী দাবী করেন নি। তাছাড়া উভয় জাহানে হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব কেবল নবুয়াতের কারণে স্বীকার করা হয় না বরং প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত দলীলাদির কারণেই স্বীকার করা হয়। আর একটি বিষয় বিবেচ্য যে এখানেতো হুযূর আলাইহিস সালাম বললেন আমি মানুষ নবী। কিন্তু অনেক সময় লোকেরা বড় বড় মোজেজা দেখতে চেয়েছে এবং তিনি বিনা দ্বিধায় দেখায়ে দিয়েছেন। যেমন চাঁদকে দু'টুক্‌রা করেছেন, ডুবন্ত সূর্যকে ফিরায়ে এনেছেন, মৃতকে জীবিত করেছেন। স্মর্তব্য যে হুযূর আলাইহিস সালাম যদি আমাদের মত অক্ষম বান্দা হতেন তাহলে এ সমস্ত মোজেজা কি করে দেখালেন? আসল কারণ হলো যারা এ সব কাজকে নাবুয়াতের মাপকাটি হিসেবে দেখতে চেয়েছে, তাদেরকে দেখানো হয়নি এবং যারা খোদা প্রদত্ত রাজত্বের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে, তাদেরকে দেখানো হয়েছে। সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন, আমি ইচেছ করলে পাহাড় সোনায় পরিণত হয়ে আমার অনুগামী হতো। এতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি এ কাজ করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু প্রকাশ করেন না।

বলুন, বর্তমান যুগের বাদশাহ কি স্বর্ণের বা দুধের নহর তৈরী করে দেখাতে পারেন? কক্ষনো না। তাসত্ত্বেও তিনি ক্ষমতাবান। আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যদি স্বর্ণের পাহাড় তৈরী করার ক্ষমতা নাও থাকে এতে তাঁর মালিকানা, রাজত্ব ও খোদাপ্রদত্ত অধিকার সমূহের কিবা তারতম্য হতে পারে? সৃষ্টি এক জিনিস এবং মালিকানা অন্য জিনিস। সৃষ্টির অস্বীকৃতিকে মালিকানার অস্বীকৃতির দলীল হিসেবে পেশ করা মুর্খতার

পরিচায়ক।

আপত্তি নং ৯ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তার দ্বীনি প্রচারনার প্রথম দিকে হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনাহা)কে সম্বোধন করে বলেন- হে ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ! তুমি আমার সম্পদের যা চাও চেয়ে নাও, وَلَا أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا আমি তোমার থেকে খোদার গজব অপসারিত করতে পারবো না। যখন হুযুর আলাইহিস সালাম স্বীয় কলিজার টুক্‌রা ফাতেমার মসীবত দূরীভূত করতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রে আমাদের মসীবত কিভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হবেন? এবং তাঁর মালিকানাই বা কিভাবে প্রমাণিত হয়?

জবাবঃ এ আয়াতে স্বয়ং সম্পুর্ণ সত্ত্বাগত মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ হে ফাতেমা, তুমি যদি ঈমান গ্রহন না কর এবং তোমার উপর আজাব আসাটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তাহলে আমি আল্লাহর মুকাবিলায় তোমার মসীবত দূরীভূত করতে পারি না। এর দ্বারা অন্যদের শুনানোই উদ্দেশ্য। এ জন্য مِنَ اللّٰهِ বলা হয়েছে। এটা কেউ বিশ্বাস করে না যে আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর মুকাবেলা করতে পারে। কেউ যদি কিছু করে, তা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে করে থাকে।

এসব আপত্তির মূল কারণ হচ্ছে, আপত্তিকারীরা সালতানতে মুস্তাফার অর্থ বুঝেনি, সত্ত্বাগত ও প্রদত্ত এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে নি।

শামী ১ম খণ্ড মৃত ব্যক্তির গোসল শীর্ষক অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, এ হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক কর্তৃত্ব প্রদান করা ছাড়া আমি তোমাদের মসীবত দূরীভূত করতে পারি না। হুযূর আলাইহিস সালাম সুপারিশের মাধ্যমে যেখানে অপরিচিত লোকদের উপকার করবেন, সেখানে নিকট আত্মীয় মুমিনগণকে কেন বঞ্চিত করবেন?

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে-

كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ اِلَّا نَسَبِىْ وَسَبَبِىْ

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্ত বংশগত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

যায় কিন্তু আমারটা বজায় থাকে। এ জন্যই হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কুলছুম বিন্‌তে ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা)কে বিবাহ করেছিলেন যেন হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে তার শ্বশুরালী আত্মীয়তা বজায় থাকে। কালামে পাকে যে বর্ণিত আছে, যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন লোকদের বংশগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে- এ আয়াতের হুকুম থেকে হুযূর আলাইহিস সালামের বংশ মুক্ত। শামীর উপরোক্ত ভাষ্য থেকে বুঝা গেল হযরত ফাতিমা যোহরার বংশ তথা সৈয়দ বংশই কাজে আসবে তবে মুমিন হওয়া চায়। মিশকাত শরীফ ফজায়েলে সাহাবা শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন, আমার সাহাবীর সামান্য যব খয়রাত অন্যদের পাহাড় বরাবর স্বর্ণ খয়রাত করা থেকে উত্তম। হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র সংশ্রবে অবস্থানকারীদের যখন এ মর্যাদা, তাহলে যিনি হুযূরের কলিজার টুকরা, নয়নের মনি, তাঁর মর্যাদা কত উর্ধে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন-

خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر
ان کی اس پاك طینت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র রক্ত দ্বারা যার খামির তৈরী করা হয়েছে সেই পবিত্র আকৃতির প্রতি লাখো সালাম।

আপত্তি নং ১০ঃ বিভিন্ন হাদীছ শরীফ থেকে জানা যায় যে অনেক সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে বিভিন্ন মাসায়েল জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজে উত্তর না দিয়ে ওহীর অপেক্ষা করেছেন। যেমন কিব্‌লা পরিবর্তনের হুকুম যেটা একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে এবং হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর প্রতি লোকদের অপবাদ যেটার ব্যাপারে হুযূর নিজে কোন ফয়সালা দেন নি। বরং ওহীর অপেক্ষা করেছেন। যদি হুযূর আলাইহিস সালাম নিজেই হুকুম আহকামের মালিক হতেন, তাহলে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেই ফয়সালা করে দিতেন।

مصطفے ہر گز نہ گفتے تانہ گفتے جبرائیل
جبرائیل ہر گز نہ گفتے تانہ گفتے کردگار

অর্থাৎ জিবরাইল আলাইহিস সালাম না বললে হুযূর আলইহিস সালাম

কক্ষনো কিছু বলেন না এবং আল্লাহ তাআলা না বললে, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কক্ষনো কিছু বলেন না।

জবাবঃ উপরোক্ত ঘটনাবলীর ব্যাপারে বিশেষ হেকমতের কারণে হুযূর আলাইহিস সালাম নিজের কর্তৃত্ব দেখান নি বরং সরাসরি আল্লাহর দ্বারা ফয়সালা করায়েছেন। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে- বিরোধিতাকারীরা যেন আপত্তি করার সুযোগ না পায়, খোদায়ী ফয়সালায় যেন মাসয়ালার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, কোন সময় নিরপক্ষতা প্রকাশ করার জন্য খোদায়ী ফয়সালা গ্রহন করা হয়। যেমন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহ আনহা)কে লোকেরা অপবাদ দিল। যদি হুযূর আলাইহিস সালাম নিজে ফয়সালা করে দিতেন, তাহলে মুনাফিকরা বলে বেড়াতো যে নিজের স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। কুরআনে পাক হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার যে মর্যাদা ও পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেছেন, সেটা থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন। এখন কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযী, কুরআনে হাফেজ, কুরআন তেলাওয়াতকারী তাঁর জয়গান গাইতে থাকবে। অনুরূপ হুযূর আলাইহি সালাম নিজেই যদি কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিতেন, তাহলে বিরোধিতাকারী ও মুনাফিকরা তাঁর প্রতি এ অভিযোগ আনতো যে তিনি সমস্ত নবীগণের কিবলা পরিবর্তন করেছেন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা কিবলা পরিবর্তনের দায় দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিলেন এবং ইরশাদ ফরমালেন- فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا (হে মাহবুব! আমি আপনাকে সেই কিবলার দিকে ফিরায়ে দিচ্ছি যেটার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হবেন) এখন আর কারো আপত্তি করার সুযোগ রইলো না। হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হযরত যয়নব (রাদি আল্লাহ আনহা) কে হুযূর আলাইহিস সালাম বিবাহ করলেন। এতে লোকেরা আপত্তি করলো। তখন আল্লাত তাআলা ইরশাদ ফরমালেন فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا۔ زَوَّجْنٰكَهَا অর্থাৎ আমার মাহবুবের সাথে যয়নবের বিবাহটা আমিই দিয়েছি। কারো কিছু বলার থাক্‌লে যেন আমাকে বলে। হযরত যয়নব (রাদি আল্লাহু আনহা) বলতেন যে সবের বিবাহ মা-বাপই দিয়ে থাকে। কিন্তু আমার বিবাহটা আল্লাহ পাকই দিয়েছেন। সবের বিবাহ পৃথিবীতে হয় কিন্তু আমার বিবাহটা আরশে সম্পন্ন হয়েছে।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এ সব ঘটনা দ্বারা হুযূর আলাইহিস্সালামের শুধু মালিকানা নয় বরং আল্লাহ তায়ালার অগাধ বন্ধুত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

দেখুন, আমরা আমাদের সাধারণ জিনিসপত্র নিজেরাই বিক্রি করি। কোন সাক্ষী সবুদ বা রেজিষ্ট্রির প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেমন জায়গা জমীন, ঘর-বাড়ী, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি বিনা সাক্ষী ও রেজিষ্ট্রিতে বিক্রি করি না। আমরা উভয় প্রকার জিনিসের মালিক কিন্তু যে সব জিনিসের ব্যাপারে ঝগড়া বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে সব ব্যাপারে সরকার জড়িত থাকে। আল্লাহ তাআলাও কতেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। বাদবাকী হাজার হাজার বিষয়ের সিদ্ধান্ত হুযূর নিজেই দিয়েছেন।

একটি সুক্ষ্ম কথাঃ একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে একদিন হুযূর আলাইহি সালাম ইরশাদ ফরমান, আজ আমি শয়তানকে ধরে ফেলেছিলাম। যদি আমি ওকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখতাম, তাহলে মদীনার ছেলেরা ওকে নিয়ে খেলতো। কিন্তু হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের কথা আমার স্মরণ হলো। তিনি আল্লাহর কাছে আরয করেছিলেন رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لَّايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ(হে আল্লাহ! আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, আমার পরে যেন কাউকে সেটার উপযোগী করা না হয়) তাই আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। এতে বুঝা গেল মানুষ, জ্বিন, বায়ু ইত্যাদি সব কিছু হুযূর আলাইহিস সালামের হুকুমতের অধীনে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা হয়নি। কেননা সেটা হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের বিশেষ মোজেজা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেটা অন্যত্র প্রকাশ পাওয়াটা সমীচীন মনে করেন নি।

আপত্তি নং ১১ঃ হুযূর আলাইহিস সালাম যদি সমস্ত জগতের মালিক হন, তাহলে তিনি বিলাসিতার জিন্দেগী যাপন করেন নি কেন? কেনইবা এত কষ্ট ভোগ করলেন?

জবাবঃ হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় মালিকানা আপন স্বার্থে ব্যবহার করেন নি বলে এটা প্রমাণিত হয় না যে তিনি মালিক নন। রোযা অবস্থায় আমরা সারা দিন রুটি, পানি, কিছুই গ্রহন করি না। তাই বলে কি আমরা

www.AmarIslam.com

ওসবের মালিক নই। নিশ্চয়ই মালিক, তবে ঐ সময় পানাহার করা আল্লাহর রেজামন্দীর বিপরীত হেতু আমরা বিরত থাকি। হুযূর আলাইহিস সালামও এ জগতে তাঁর মালিকানাধীন জিনিসগুলো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন নি। অথচ এ জগতের সব কিছু হুযুরের জন্য উৎসর্গীত। তাঁর এ অবদানের দ্বারা তাঁর গোলামেরাই উপকৃত হয়েছেন। কেননা তাঁর পবিত্র জীবন সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। দুনিয়াতে ধনীও আছে গরীবও আছে। হুযূর আলাইহিস সালাম যদি বিলাসিতার জীবন যাপন করতেন, তাহলে গরীবদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতো না। তাই তিনি কোন সময় সম্পদের অধিকারী হয়ে আল্লাহর শুকরীয়া ও দান খয়রাত করে ধনীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ কায়েম করেন। আবার কোন সময় সম্পদহীন হয়ে ধৈর্যের পরাকাষ্টা দেখায়ে গরীদের জন্য আদর্শ স্থাপন করেন। যেন তারাও সে রকম ধৈর্যধারণ করে।

এক যুদ্ধে হুযুর আলাইহিস সালাম ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন। অথচ এ অবস্থায় হযরত জাবের (রাদি আল্লাহ আনহু) এর ঘরে দাওয়াত করলে তার থুথু মুবারকের বরকতে চার সের যবের আটার তৈরী খাবার শত শত লোক পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন। তাই তাঁর এ সাদাসিদে জিন্দেগী অপারগতার কারণে নয় অন্যদের শিক্ষার জন্য এ রকম জিন্দেগী যাপন করেছন। আসল কথা হলোঃ

مالك كونيں ہيں پاس كچھ ركھتے نہيں
دوجہاں كى نعمتيں ہيں انكے خالى ہاتھ ميں

অর্থাৎ তিনি উভয় জাহানের মালিক কিন্তু নিজের কাছে কিছু রাখেন না। অথচ তাঁর খালি হাতের মধ্যে উভয় জাহানের নেয়ামত রয়েছে।

যে নিজে খায় না, অপরকেও খাওয়ায় না, তাকে বখীল বলে, যে নিজে খায় অপরকেও খাওয়ায়, তাকে সখী বলে এবং যে নিজে খায় না, অপরকে খাওয়ায় তাকে জওয়াদ বলে। এজন্য আল্লাহকে সখী বলা হয়না বরং জওয়াদ বলা হয়। কারণ هُوَ يُطْعِمُ وَلَايُطْعَمُ তিনি খাওয়ান, নিজে খান না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও জওয়াদগুণের অধিকারী। (তাফসীরে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

রুহুল বয়ান) অবশ্য তিনি যা কিছু খান সেটাও উম্মতের শিক্ষার জন্য। অন্যথায় তাঁর খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আল্লাহর মূখাপেক্ষী ছাড়া অন্য কোন কিছুর মূখাপেক্ষী নন। তিনি নিজেই বলেন أَيُّكُمْ مِثْلِىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ (তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমাকে তো আল্লাহ তাআলা গায়েবী পানাহার করান) হুযূর আলাইহিস সালামের জীবন যাত্রায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মানবীয় জীবন যাত্রায় ক্ষুধা অনুভব করেছেন, নূরানী জীবন যাত্রায় লাগাতার রোযা পালন করেছেন। খায়বর যুদ্ধে বিষপানে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। তবে ইন্তেকালের সময় বিষের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ ইন্তেকাল হচ্ছে মানবীয় বৈশিষ্ট্য এবং ইন্তেকালের সময় এটা প্রকাশ পায়। এটা একটি সূক্ষ্ম আলোচনা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মেরাত শরহে মিশকাত, রুহুল বয়ান বা লোমআত পড়ে দেখুন।

উপসংহার

এ কিতাব লিখার সময় আমার ঘনিষ্ট বন্ধু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শেখ আবদুল গনী সাহেব আমাকে একটি উপমা দিয়ে বলেন- রাজাভক্ত প্রজারা রাজার দিদারের জন্য ললায়িত হয়ে থাকে এবং রাজা দর্শনে ধন্য হয়ে থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই সোনালী যুগে আমরা জন্ম হইনি, এ নগন্য চক্ষু দ্বারা সেই নূরানী চেহারা মুবারক দেখার সুযোগ পাইনি এবং মনের এ ব্যথা প্রকাশ করতে পারিনিঃ

ہوتے صدقے کبھی ناقہ کبھی محمل کے
ساربان کے کبھی ہاتھوں کی بلا ئیں لیتے
دشت طیبہ میں ترے ناقہ کے پچھے پھچے
دھجیان جیب وگر بیاں کی اڑاتے جاتے

তেরশ বছর পর জন্ম হয়ে আমরা অভাগারা কি আর করতে পারি। আপনি অন্ততঃ হুযূর আলাইহি সালামের হুলিয়া মুবারক (দৈহিক আকৃতি)টা বর্ণনা করতে পারেন। যেটা পড়ে আমরা যেন কিছুটা শান্তনা বোধ করতে পারি। তার এ মনোভাবটা আমার খুবই পছন্দ হলো এবং হুলিয়া মুবারক বর্ণনা করে এ কিতাবটি সমাপ্ত করবো বলে মনস্থ করলাম। মুসলিম ভাইদের কাছে আবেদন এ হুলিয়া মুবারকটা যেন নিজ নিজ মনে গেঁথে নেয়, যাতে এ অবস্থা হয়ঃ

دل کے ائیہ میں ہے تصویر یار
جب ذر اگردن جھکائی دیکہ لی

অর্থাৎ মনের আয়নায় রয়েছে প্রিয় বন্ধুর প্রতিচ্ছবি। চোখ বন্ধ করে একটু মাথা নত করলেই তাঁকে দেখতে পাই। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন, সেই ঘরই সুশোভিত থাকে, যে ঘরে গৃহ কর্তা থাকে। যে ঘরে মালিক থাকে না, সে ঘরের কোন অস্তিত্ব থাকে না। অনুরূপ সেই কলবটা আবাদ, যেটাতে তাঁর ধ্যান আছে, অন্যথায় বরবাদ।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

آباد وہی دل ہے جس میں تمہارے یاد ہے

جو یاد سے غافل ہوا ویواں ہے برباد ہے

অর্থাৎ সেই কলবটাই আবাদ যেটাতে আপনি জাগরুক আছেন এবং যে কলবটা আপনাকে স্মরণ রাখেনি, সেটা অকেজো বিধ্বস্ত।

সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহ আনহুম) হাদিছ বর্ণনা কালে মাঝে মধ্যে জোশে এসে বলে ফেলতেন كَأَنِّيْ أَنْظُرَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ।মনে হয় আমি যেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখতেছি। হুযূর আলাইহিস সালামের আকৃতি তাঁদের মনে সদা জাগরুক থাকতো।

প্রিয় নবীর ধ্যানের পরীক্ষা কবরেও হবে। মনকির নকির জিজ্ঞেস করবেন مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُلِ(তুমি এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে?) নিঃসংগ অবস্থায় এ দর্শন বড় আনন্দের ব্যাপার।

دل میں ہو یاد تیری گوسہ تنہائی ہو

پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرای ہو

অর্থাৎ একাকীত্বের মধ্যে মহা সমাবেশের জাঁক জমক ফুটে উঠে যখন হৃদয়ে আপনার স্মরণ জাগরুক থাকে।

আবার সমাবেশের মধ্যে একাকীত্বের স্বাদ পাওয়া যদি সমাবেশেটা এ রকম হয়ঃ

سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں

انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو

অর্থাৎ সারা বিশ্ব ব্যাপী সমাবেশের মধ্যে থাকলেও একাকীত্বের স্বাদবোধ করি যখন অন্তরের চোখে আপনাকে দেখতে পাই।

এবার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র দৈহিক আকৃতির বর্ণনা শুনুন এবং ঈমান তাজা করুন।

www.AmarIslam.com

اللّٰہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ

ان سانہیں انسان انسان ہیں یہ

قرأن تو کہنا ہے کہ ایمان ہیں یہ

ایمان یہ کہتا ہے کہ مری جان ہیں یہ

অর্থাৎ তাঁর আপাদ মস্তক আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি অতুলনীয় মানুষ। তিনি ঈমানের প্রাণ কেন্দ্র।

ইমাম আবু ঈসা তিরমীযী তিরমীযী শরীফের শেষে শামায়েলে তিরমীযী নাম দিয়ে হুযূর আলাইহিস সালামের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। আমি সেখান থেকে হুযূর আলাইহিস সালামের দৈহিক আকৃতির বর্ণনাটি নকল করে আপনাদের সামনে পেশ করলাম।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হুলিয়া মুবারক

মাহবুবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দৈহিক গঠন প্রণালী অপুর্ব বৈশিষ্ট্যময়। দেহের উচ্চতা মধ্যম পর্য্যায়ের অর্থাৎ অতি লম্বাও নয় আবার অতি বেটেও নয়। পবিত্র শরীরের রং লালচে সাদা (গোলাপ ফুলের মত) ধবধবে ফর্সাও নয় এবং বাদামী রংও নয়। চুল মুবারক খুবই সরু ও কুচ কুচে কালো যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি। কিছুটা কোঁকড়ানো, পুরাপুরি সোজাও নয়, বাঁকাও নয়। এ চুল মুবারক প্রায় সময় কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে থাকতো, কোন কোন সময় কাধ পর্যন্ত লম্বা হতো। তাঁর মস্তক মুবারক বড় ও খুবই সুন্দর ছিল। দু'ভ্রুর মাঝখানে একটি সরু রগ ছিল যেটা মাঝে মধ্যে চমকাতো। চক্ষুদ্বয় ছিল বড় বড়। পলক লম্বা, চোখের আভ্যন্তরীন সাদা অংশটি সতেজ এবং পুতলিদ্বয় খুবই কালো ছিল যেটা আল্লাহকে দেখে কুঞ্চিত হয় নি। নাসিকা মুবারক ছিল সরু ও লম্বা এবং মুখমণ্ডলের রং ছিল খুবই উজ্জল। চেহারা মুবারক বেশী ফুলাও ছিল না আবার ভাঙ্গাও ছিল না। ওষ্ঠদ্বয় ছোট ও পাতলা ছিল, গোলাপ ফুলের পাপঁড়ির মত দেখাতো। দাঁত মুবারক ছিল উজ্জল ধবধবে সাদা এবং আকৃতিতে ছোট ছোট যেমন মুক্তার মালা। দু'দাঁতের মাঝখানে একটু একটু ফাঁক ছিল। দাড়ি মুবারক ছিল ঘন ও কালো, ঘাড় মুবারকের রং ছিল খুবই পরিস্কার। দু কাধের মাঝখানে ঘাড়ের সোজা নীচে ছিল 'মুহরে নাবুয়াত'। এটা ছিল কবুতরের ডিমের বরাবর একটি ফুলা মাংসপিণ্ড। যার উপরে লিখা ছিল محمد (মুহাম্মদ)। হযরত সালমান ফার্সী ও আরও অনেকে এটা দেখে ঈমান এনেছিলেন। বক্ষ মুবারক ছিল প্রশস্ত ও রহমতের ভাণ্ডার। গলা থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি সরু রেখা ছিল। পেট মুবারক বক্ষের বরাবর ফুলা ছিল না এবং তত ধাবিতও ছিল না। বাহুদ্বয় ছিল রিষ্টপুষ্ট, হাতের আঙ্গুল মুবারক ছিল সরু ও লম্বা। পায়ের গোচা ছিল পুষ্ট যার উপর ছিল পাতলা লোম। পায়ের গোড়ালী ছিল পাতলা এবং পা মুবারক ছিল ভরাটে। পায়ের তালুটা পুরাপুরিই মাটির উপর রাখা যেত।

হযরত জাবের (রাঃ) ফরমান, একবার চাঁদনী রাতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম) লাল রং এর চাদর গায়ে দিয়ে তশরীফ এনেছিলেন। আমি একবার আকাশের চাঁদের দিকে একবার মদীনার চাঁদের দিকে থাকাচ্ছিলাম। খোদার কসম, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে চাঁদ থেকে অধিক সুন্দর মনে হচ্ছিল।

অন্যান্য গুণাবলী

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরানী চেহারা মুবারক ছিল প্রভাবমণ্ডিত। যে কেউ হঠাৎ তাঁকে দেখলে মনের মধ্যে পরকালীন ভীতি সৃষ্টি হতো। তাঁর সংশ্রবে থাকার যার সৌভাগ্য হতো সে তাঁর পবিত্র চরিত্রগুণে এমনভাবে মোহিত হয়ে যেত যে অন্য কোথাও তার মন বসতো না। হুযূর আলাইহিস সালামের দৃষ্টি প্রায় সময় নীচের দিকে থাকতো।

اك ماه بدن گورا سابدن نيچى نظريں كل كى خبريں
وه سناكے سخن دكهلا كے پهبن مرا پهونك گئے سب تن من دهن

অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে দৃষ্টি নীচের দিকে থাকলেও সমগ্র জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। তাঁর পবিত্র মুখের কথা শুনলে আর কোন কিছুর কথা খেয়াল থাকে না।

তাঁর চেহারা মুবারকে সব সময় চিন্তাভাবনার লক্ষণ পরিলক্ষিত হতো যেন তিনি কিছু চিন্তা করছেন। যখন কারো দিকে থাকাতেন তখন ওর দিকে পুরাপুরি মুখ ফিরায়ে থাকাতেন। কোন সময় অট্রহাসি দিতেন না। প্রায় সময় এমনভাবে মুচকি হাসতেন যে তাঁর দাঁত মুবারক থেকে নূরানী আলোকছটা দেখা যেত। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, সেই নূরের আলোতে হারানো সুঁই খুঁজে বের করা যেত।

سوزن گم شده ملتى ہے تبسم سے ترے
شام كو صبح بناتا ہے اجالا ترے

অর্থাৎ আপনার মুছকি হাসিতে দাঁতের বিচ্ছুরিত ঝলকে হারানো সুঁই খুঁজে পাওয়া যায়। আপনার নুরের ছটায় সন্ধ্যাকে সকালের মত দেখায়।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাঁর পবিত্র ঘামে গোলাপ ফুলের সুগন্ধ ছিল। তিনি যখন কোন গলি দিয়ে যেতেন তখন গলির আশে-পাশের বাসিন্দারা টের পেতেন। মদীনাবাসীরা সেই ঘামকে সুগন্ধ হিসেবে ব্যবহার করতেন (মিশকাত) তিনি চলাফেরা করার সময় জমীন এমনভাবে সংকুচিত হয়ে যেত যে তিনি আস্তে আস্তে চললেও সাথীদেরকে দ্রুত গতিতে চলতে হতো। তিনি কখনো খেজাব ব্যবহার করেন নি। কেননা তাঁর মস্তক মুবারকে মাত্র চৌদ্দটি চুল সাদা হয়ে ছিল এবং দাড়ি সাদা হয়েছিল মাত্র ছয়টি। চুল দাড়ি মিলে মোট বিশটি সাদা হয়েছিল। তাঁর চুল ও দাড়ি মুবারক দর্শনকারীদের মধ্যে যারা হুযূরের চুল দাড়িতে খেজাব লাগিয়েছেন বলে রেওয়ায়েত করেছেন, তারা সুগন্ধির রংকে খেজাব মনে করেছেন, যেটা হুযুর আলাইহিস সালাম চুল দাড়িতে লাগাতেন।

খাবারের মধ্যে ছাগলের সামনের রান, সিরকা, মধু , মিষ্টান্ন দ্রব্য এবং কধু অধিক পছন্দ করতেন। অবশ্য মোরগ, বটের (এক প্রকার ছোট পাখী) ছাতু ও খোরমা খাওয়াটা প্রমাণিত আছে। তাছাড়া ডেকের তলানী খাদ্যের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। অনেক সময় খেজুর দিয়ে যবের রুটি খেতেন।

হুযূর আলাইহিস সালাম সাদা পোষাক পছন্দ করতেন। প্রায় সময় পাগড়ী, জামা ও তোহবন্দ পরিধান করতেন। মাঝে মধ্যে কালো পাগড়ীও ব্যবহার করতেন বলে প্রমাণিত আছে। ইয়ামানী ছাদর ও তালি লাগানো কম্বল তিনি সব সময় ব্যবহার করতেন।

এ আরশী মেহমান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিছানা মুবারক ছিল কোন সময় দু'ভাজ করা ছট এবং কোন সময় খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার তোষক।

একটি উপদেশ

পাঠক বৃন্দ! রাত্রে শয়নকালে এ হুলিয়া শরীফ পাঠ করবেন এবং পবিত্র বিছানায় পবিত্র কাপড় পরিধান করে অযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করবেন। সম্ভব হলে আতরও ব্যবহার করবেন। এ আশা পোষণ করে শয়ন করবেন যেন স্বপ্নে হুযূর আলাইহিস সালামের দীদার নসীব হয়। এ অবস্থায় কেউ হুযূরকে স্বপ্ন দেখলে সে সত্যি সত্যি হুযুরকেই দেখলো। সেটা নফসানী, শয়তানী, বা কাল্পনিক হতে পারেনা। বরং বাস্তবিকই দর্শন লাভ করে থাকে। হুযূর আলাইহিস সালামের চেহারা মুবারক উজ্জল দেখাটা হচ্ছে নিজের ঈমানী শক্তির পরিচায়ক এবং এর বিপরীত দেখাটা নিজের দুর্বল ঈমানের লক্ষণ। অনুরূপ উত্তম পোষাকে দেখা নিজের নেক আমলের লক্ষণ এবং বিপরীত দেখাটা নিজের বদ আমলের লক্ষণ। মসনবী শরীফে বর্ণিত আছে-

گفت من ائینه مقتول دوست

ترکی دہندی به بیند آں که اوست

অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালাম হচ্ছেন আল্লাহর কুদরতী আয়না। এ আয়নায় নিজের রং দেখা যায়। হুযূর আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ যথাযথ দেখে নাই।

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/